# হুচ্

একটি সমন্বিত প্রয়াস

৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা ২০১৩



**হুচ্**

**সম্পাদক**
আলোড়ন খীসা

**সম্পাদনা সহযোগী**
দীপন চাকমা

**প্রকাশকাল**
এপ্রিল ২০১৩

**মুদ্রণ**
পুনশ্চ, ২৭৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০।

**যোগাযোগ**
সেল ফোন : ০১৬৭০ ৭০১২০৯, ই-মেইল : alokhisa@gmail.com

**মূল্য**
৪০.০০

০৫
সম্পাদকীয়
০৬
আদিবাসী কবিতা বলে কিছু আছে বা থাকা উচিত কি?
প্রশান্ত ত্রিপুরা
১৩
আদিবাসীদের বিকাশ এবং ব্যাপারীদের bKash
পাইচিংমং মারমা
২৩
পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকাশনা :
স্বাধীন প্রকাশনা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা
হেগা চাকমা
৩৪
পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িকতার উৎসমুখ
এডিসন চাকমা
৪৮
যুগে যুগে বিদ্রোহ
শোষণের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের প্রতিরোধ
অজল দেওয়ান
৫৩
অল্পস্বল্প বচন
সুমেধ তাপস চাকমা
৫৭
শিকড়বিহীন আদিবাসী : অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্রতা
অজল দেওয়ান
৬২
শুভাশীষ চাকমার স্বপ্ন
অদ্রি প্রথম

**কবিতা**

শিশির চাকমার কবিতা ৬৪
নিকোলাই চাক্‌মা ৭০
আলোড়ন খীসার কবিতা ৭১
জে আর কার্বারী ৭৪
হেগা চাক্‌মা ৭৬

## সম্পাদকীয়

অনেকদিন পর দেখা দিয়েই অনেকেই দেখি লিখে থাকেন "পর্যবেক্ষণ"। না, আমরা তা বলবো না। আমাদের ইচ্ছা ছিলো কিন্তু উপায় ছিলো না। খেয়ে পরে বাঁচার তাগিদে ব্যাক্তিক এবং সামষ্টিক বিভিন্ন ঝামেলায় আমরা আমাদের জড়িয়ে ফেলেছিলাম, তাই ইচ্ছা আর সদিচ্ছা-তে পরিণত হয় নি।

এই যে ঝামেলা তা কিন্তু প্রাকৃতিক নয়, বানানো, পুঁজিবাদের। পুঁজিবাদ সারা বিশ্বকেই তার নিজের মত করে ছাঁচে গড়ে-পিটে তুলবে তা সে আদিবাসী-অধ্যুষিত অরণ্যই হোক, বাঙালি কৃষক-সমাজই হোক, ডাচ বা বেদুইন পশুপালক গোত্রই হোক। কেননা পুঁজিবাদ চায় ক্ষমতা এবং ক্ষমতার প্রয়োগই তার অপ্রকাশ্য লক্ষ্য। এই যাতাকলে পড়ে আমরাও গড়ছি-পিটছি, হাজার হোক আধুনিক তো! তাই চেয়েছিলাম নিরেট উত্তর উপনিবেশবাদ নিয়ে পুরোটা কাগজ জুড়ে আলোচনা করতে। কারণ এই বিষয়টি আদিবাসী মননে ও গড়নে যে পরির্বতন এনেছে তা কিছু পড়াশোনা করা মানুষ ছাড়া অন্যদের কাছে বেশ আঁধারেই রয়ে গেছে আমাদের মত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে। এই আধুনিক বা আধুনিকোত্তর পর্বে কয়েকটি বিষয় যা আমাদের মননে আর গড়নে বেশ পরিবর্তন আনছে তা নিয়ে তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক কিছু আলোচনা আমরা একসঙ্গে করতে পেরেছি এই সংখ্যায়। আশা করছি পাঠকগণ আমাদের নিরাশ করবেন না, বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের সাথে দ্বন্দ্ব করবেন যাতে আমরা একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি।

যে কোন প্রকার সমালোচনা, আলোচনার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত। আমাদের সাথে দ্বন্দ্ব করতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। এই সংখ্যায় অনেক সীমাবদ্ধতা ছিলো যেগুলো কাটিয়ে উঠতে অনেকের সহযোগিতা আমরা পেয়েছি, তাঁদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করার জো নেই। আশা করছি এই সহযোগিতার হাত সামনেও আমরা পাবো।



# আদিবাসী কবিতা বলে কিছু আছে বা থাকা উচিত কি?

প্রশান্ত ত্রিপুরা

১।

কেন এই প্রশ্ন

শুরুতেই বলে নেই শিরোনামে তোলা প্রশ্নটি কেন উঠেছে। এটি কখনো অন্যদের মনে জেগেছে কিনা আমি জানি না, তবে আমার বেলায় তা ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে অন্ততঃ দু'বার আদিবাসী কবির তকমা পরার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে গিয়ে। প্রথমবার ছিল একটা কবি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার একটা আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে, আর দ্বিতীয়বার একটা আদিবাসী কবিতা সংকলনে আমার কাছ থেকে কবিতা চেয়ে একজন আমার সাথে যোগাযোগ করার পর। প্রথমবারের অভিজ্ঞতাটা ছিল অনেকটা অপ্রত্যাশিত আমার কাছে, যার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ফেসবুকে লিখেছিলাম : আজ ফোনে আমন্ত্রণ পেলাম আসন্ন একটা কবি সম্মেলনে, আদিবাসী কবিদের একটা সেশন আছে, তাতে। আমি কবি নই। যদি হতামও, আদিবাসী কবি হিসাবে পরিচিত হতে চাইতাম না। সম্প্রতি একটা টক শোতে [স্টুডিও রেকর্ডিং-এর সময়] আমার যে পরিচয় দেওয়া হল, একজন আদিবাসী গবেষক- আমার কানে লেগেছিল। 'আদিবাসী' পরিচিতির পক্ষে, ও এর স্বীকৃতির দাবীতে আমি লেখালেখি করেছি, এখনো করি। তাহলে কেন আমার এই অস্বস্তি ও আপত্তি? 'আদিবাসী' পরিচিতির দাবীটা রাজনৈতিক, এবং আমি মনে করি এই পরিসরেই এর প্রয়োগ সীমিত থাকা উচিত। এর বাইরে কবিতা, সাহিত্য ইত্যাদির অঙ্গনে এটির ঢালাও প্রয়োগ গোলমেলে, অনেক ক্ষেত্রে অর্থহীন, এমনকি অবমাননাকরও। [নভেম্বর ১, ২০১২]

উপরের কথাগুলো প্রকাশের পর ফেসবুকে বেশ সমর্থনসূচক সাড়া পেয়েছিলাম, যাতে বুঝেছিলাম যে, আমার মনে যে অস্বস্তি বা প্রশ্ন জেগেছিল আদিবাসী কবির আসনে বসার ব্যাপারে, তা অবান্তর ছিল না। তবে দু'একজনের মন্তব্যে মিশে ছিল কিছু প্রশ্ন, সংশয়, বা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ। এগুলোর প্রেক্ষিতে আমি তাৎক্ষণিকভাবে যেটুকু সম্ভব, আমার বক্তব্যের পেছনকার যুক্তি ও বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। তবে মনে হচ্ছিল, বিষয়টা নিয়ে আরো বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার। সেই তাগিদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কিছু খসড়া ভাবনার উপর ভিত্তি করে এই রচনাটাকে দাঁড় করানো হয়েছে। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটাও একটু খুলে বলি। প্রথমটার পর মাস দেড়েক না যেতেই ফেসবুকে একটা বার্তা পেলাম যে, বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিতব্য একটা আদিবাসী কবিতার সংকলনের জন্য আমার একটা কবিতা নাকি বাছাই করা হয়েছে। আমার কাছে জানতে চাওয়া হল, 'নির্বাসিত শব্দমালা' নামের আমার একটা কবিতা যেটিকে

১৯৮৯ সালের লংগদু হত্যাকাণ্ডে নিহতদের স্মরণে এই নিবেদন সমেত ছাপানো হয়েছিল হাফিজ রশিদ খান সম্পাদিত 'অরণ্যের সুবাসিত ফুল' শিরোনামের একটা সংকলনে, ওটার সাথে আমি আরো কিছু কবিতা যোগ করতে পারব কিনা। আমি আমার দিক থেকে সংক্ষেপে জানালাম, 'আদিবাসী কবি' বা 'আদিবাসী কবিতা' বর্গ নিয়ে আমার আপত্তি আছে। ফিরতি বার্তায় একটা ব্যাখ্যা আসল, যা ফেলে দেওয়ার মত না, যে, "সংকলনে কেবল আদিবাসীদের লেখা থাকছে। বাংলাদেশের কাব্যালোচনায়, কাব্য-সংকলনে আদিবাসী কবিরা একেবারেই উপেক্ষিত। অথচ, আদিবাসীরাও যে যার-যার ভাষায় (বা বাংলায়) অনেক ভালো লিখছেন, তার সঙ্গে পাঠক-গবেষকদের পরিচিতি ঘটানোর দায় এই সংকলনের একটি উদ্দেশ্য।" এই কথোপকথন যাঁর সাথে হচ্ছিল, তিনি ছিলেন হিমেল বরকত, যাঁর সম্পাদনায় 'বাংলাদেশের আদিবাসী কাব্যসংগ্রহ' নামে একটা বই শেষ পর্যন্ত বেরিয়েছিল বইমেলা চলাকালে। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকাতে তাঁর সর্বশেষ বার্তার জবাবে আর কিছু লিখতে পারিনি আমি। এ প্রেক্ষিতে আমার বর্তমান লেখাটিকে তাঁর সাথে সূচিত দ্বিপাক্ষিক মত বিনিময়ের পরবর্তী উন্মুক্ত কিস্তির অংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে। হিমেল বরকতের সম্পাদিত 'আদিবাসী কাব্যসংগ্রহ' আমি হাতে পাই নি এখনো, তবে বর্তমান রচনায় হাত দেওয়ার পর জেনেছি যে আমার লেখা 'নির্বাসিত শব্দমালা' যা আসলে ছিল কবিতার আদলে লেখা আমার দিনলিপি বিশেষ- ওতে ঠিকই রেখে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য বাদ দেওয়া হলেও তেমন কিছু এসে যেত না। কারণ, হাতের কাছে হাফিজ রশিদ খানের সম্পাদিত 'অরণ্যের সুবাসিত ফুল' বইটা আছে, ওটাতেও মূল শিরোনামের নীচে লেখা, 'আদিবাসী কবিতার নির্বাচিত সংকলন' বইটা খুলে ভেতরে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিলাম, হ্যাঁ, আমার নাম এবং 'নির্বাসিত শব্দমালা' ওতে আছে, ছয় জাতিভুক্ত ষাটের অধিক কবি ও ততোধিক কবিতার ভিড়ে। অর্থাৎ আমি চাই বা না চাই, আমি জানি বা না জানি, আমার নাম ও আমার লেখা কিছু পঙ্‌ক্তি, আগে থেকেই ঢুকে আছে 'আদিবাসী কবি ও কবিতা'র বৃত্তে। বাকীদের কথা জানি না, তবে আমার এই নিবন্ধ হচ্ছে আমার নিজের দিক থেকে এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস, সেটিকে ভাঙতে চাওয়ার ঘোষণা।

২।

অহং প্রসঙ্গ

অন্য কোন বিষয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে 'কবি সম্মেলনে' ডাক পাওয়ার প্রেক্ষিতে নিজেকে করা একান্তই ব্যক্তিগত একটা প্রশ্নের মীমাংসা আমি করে নিতে চাই প্রকাশ্যে। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণে নিজের অপারগতা ব্যাখ্যায় শুরুতেই আমি বলেছিলাম, 'আমি কবি নই'। তবে কবিতা লেখার চেষ্টা কখনো করি নি, তাতো নয়, যদিও সেই চেষ্টাগুলো কবিতার মানদণ্ডে কতটা উত্তীর্ণ হয়েছে, সেই প্রশ্নের মুখোমুখি সেভাবে হতে হয় নি কখনো। কবিতার সীমানায় কিছুটা ঘোরাফেরা করেছি হয়তবা, খোলা জানালা পেলে তা দিয়ে কখনোবা উঁকিও মেরে দেখেছি দূর থেকে, কিন্তু ভেতরে সমবেত বোদ্ধা পাঠক বা সমালোচকদের নজরে পড়ার কোন চেষ্টাই কখনো



করি নি। করলে একটা আসন যে পেতে পারতাম, তা ভাবার মত কিছু কারণ অবশ্য ছিল। যেমন, আমি ঢাকায় উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময় বাংলার শিক্ষক রাজ্জাক স্যার আমার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখাতেন। তিনি বলতেন আমি নাকি ভাষা নিয়ে খেলা করতে পারতাম। ক্লাস থ্রিতে সরকারি প্রাইমারিতে ভর্তির পর বাংলা জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য অপদস্থ হওয়া একজন মানুষ হিসাবে আমার কাছে এই স্বীকৃতি ছোটবেলার সেই লজ্জার একটা জবাব হতে পারত। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে তখন সেভাবে ভাবতাম না। প্রকৃতপক্ষে, সেই গ্লানিকর অভিজ্ঞতার কথা আমি আমার কলেজের সহপাঠী বা শিক্ষকদের কাউকে কখনো বলেছিলাম বলে মনে পড়ে না। কাজেই রাজ্জাক স্যার আমাকে করুণা করে, বা 'আদিবাসী হয়েও তুমি এত চমৎকার বাংলা কীভাবে লেখ ! এমন কোন বিস্ময়বোধ থেকে আমাকে বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর দিতেন, এমনটা আমার কখনো মনে হয় নি। তাছাড়া সার্বিকভাবেও ছাত্র হিসাবে আমার অবস্থান খারাপ ছিল না। কাজেই রাজ্জাক স্যারের প্রশংসা, এবং এরকম আরো কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (যেমন, বুয়েট নামের একটা বৃক্ষহীন দেশে একবছর কাটানোর সময় আমার লেখা একটা এরন্ডারূপী কবিতা আন্তঃহল সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল), আমার মনের গভীরে একটা অহংবোধের প্রলেপ হয়ত রেখে দিয়েছিল। তবে সময়ের স্রোতে এ ধরনের একান্ত সঞ্চয়ের অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছিল, বা বাক্সবন্দী হয়ে ছিল বহুকাল, যদিও কবিতার আদলে আমার বিভিন্ন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখে রাখার একটা অভ্যেস আমার ছিল, এবং খুব সীমিত গণ্ডীর ভেতরে সেগুলোর কিছু নমুনা আমি একবার মলাটবন্দী করেছিলাম প্রিয়জনদের জন্য। এসবের বাইরে 'কবি' হিসাবে পরিচিতি চাওয়া বা পাওয়ার মত কোন প্রেক্ষিতে কখনো নিজেকে দেখি নি। (এদেশের প্রথিতযশা কবিদের মধ্যে হাতে গোণা কয়েকজনের সাথে দৈবাৎ ওঠা বসা হয়েছিল আমার, যেগুলোর মধ্যে শামসুর রাহমানের সাথে একবার এক মঞ্চে বসে কথা বলার স্মৃতি আমার আছে। তবে আমি কলকে পেয়েছিলাম নৃবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে, তাও নিজের পাড়ায়, রাঙামাটিতে 'আদিবাসী মেলা' সংশ্লিষ্ট একটা অনুষ্ঠানে। কী বিষয়ে কথা বলেছিলাম আমার এখন মনে নেই, তবে একটা কথা বেশ মনে আছে, আলোচনানুষ্ঠান শেষে শামসুর রাহমান আমাকে শুধু এটুকু বলেছিলেন, 'আপনিতো খুব ভাল বাংলা বলেন!') তাই সবকিছু মিলিয়ে 'কবি সম্মেলনে' ডাক পাওয়াটা আসলেই অপ্রত্যাশিত ছিল আমার কাছে, এবং তাতে আমি বেশ অপ্রস্তুত ও বিব্রতই বোধ করেছিলাম। ব্যাপারটা যেনবা এমন ছিল যে, যেখানে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষাও দেই নি, আমাকে স্নাতক পর্যায়ের সনদ দেওয়া হয়েছে আদিবাসী কোটায় এবং সে সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে ডাকা হচ্ছে, যদিও কোন কিছুর জন্যই আমি আবেদনই করি নি! যাহোক, একান্তই আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার বাইরে অহং-এর বিষয়টা অন্য একটা প্রেক্ষিতেও প্রাসঙ্গিক, যা সাধারণভাবে বিবেচনার দাবী রাখে। সেটা হল 'আদিবাসী' পরিচয়ের বিশেষত্ব সংক্রান্ত, যেটাকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, আইনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। তবে যেদিক থেকেই আমরা দেখি না কেন, একটা প্রশ্ন থেকে যায়, তা হল, আদিবাসী বিশেষত্বের মূল ধারক বাহক কে- ব্যক্তি না সমষ্টি? যেসব সম্মেলন বা

সংকলন হয়ে ওঠে অহং-এর মঞ্চ, বা হাজিরা খাতা ধরে বিভিন্ন মাপের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের নাম ডাকা, সেগুলোতে 'আদিবাসী' পরিচয়ের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসাবে বিবেচিত 'যৌথতা' বা 'সামষ্টিকতা'র কোন জায়গা আছে কি? আদিবাসী বর্গের মধ্যে আবার লুকিয়ে আছে গোণায় নেওয়া হয় নি, বা নামও ভাল করে জানা নেই, এমন কিছু জনগোষ্ঠীসহ তিন থেকে চার ডজন জাতি, যাদের বেশিরভাগেরই রয়েছে আলাদা ভাষা, স্বকীয় ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র চেতনা। কিছু ব্যক্তির নামখচিত পেয়ালায় বাংলায় পরিবেশিত কাব্যরস এই বৈচিত্র্য কতটুকু তুলে ধরতে পারবে? যদি সেভাবে না পারে, তাহলে এমন অনুশীলনের উদ্দেশ্য, তাৎপর্য বা ফলাফল কী, সে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

৩।

অন্যতার খাস জমিতে আদিবাসী কবিতার চাষ

আদিবাসী পরিচয়ের গুরুত্ব মূলতঃ রাজনৈতিক, যেখানে অধিকারের প্রশ্ন, এবং অধিকার আদায়ের প্রয়াস জড়িত। স্পষ্ট করে বললে, আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় বিশেষ কিছু অধিকার (ভূমির উপর 'প্রথাগত অধিকার' সহ অন্যান্য 'সামষ্টিক অধিকার') আদায়ের লক্ষ্য ও প্রত্যাশা নিয়ে, আদিবাসী পরিচিতির ছাদের নীচে জড়ো হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনে কোণঠাঁসা হয়ে পড়া বহু জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই প্রয়াসের সাথে আমার নিজের সম্পৃক্ততা ঘটেছিল ১৯৯৩ সালে, যখন জাতিসংঘ ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ' উপলক্ষে তৎকালীন বিরোধীদলীয় দুই সাংসদের নেতৃত্বে আয়োজিতব্য একটা সেমিনারের মূল প্রবন্ধ লেখার ভার আমি নিই। অনুষ্ঠানের আগের রাত পুরোটা জেগে থেকে শেষ করা সেই লেখার বড় অংশ জুড়ে ছিল একটা সরল প্রশ্ন, যা সংশ্লিষ্ট অনেকের মাঝেই তখন ছিল, যে, ইংরেজি ইনডিজেনাস শব্দের সমার্থক হিসাবে বাংলায় 'আদিবাসী' শব্দটা যেটা 'আদিম' অর্থে আগে থেকেই চালু ছিল ব্যবহার করা কতটুকু যৌক্তিক হবে। উত্তরে আমি লিখেছিলাম, "আদিবাসী শব্দটি বাংলায় অবজ্ঞাসূচক অর্থ বহন করে। কাজেই যে বিশেষ অর্থে এবং ইতিবাচক উদ্দেশ্যে [ইনডিজেনাস] কথাটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলনের চেষ্টা চলছে, আদিবাসী কথাটির মাধ্যমে তা সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না। ...[তবে] আদিবাসী নামে পরিচিত মানুষেরা নিজেরাই যদি সগৌরবে এ আখ্যাকে ধারণ করে দেশের ভিতরে এবং বাইরে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, তাহলে এটি একদিন ইতিবাচক অর্থই বহন করবে।" বিশ বছর পরে আমরা কি দেখি? 'আদিবাসী' শব্দটা এখন সাধারণভাবে ইতিবাচক অর্থ বহন করছে কিনা, তা আমরা জানি না, তবে ক্ষমতার কিছু খাস কামরায় এটি আবির্ভূত হয়েছে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে। সরকারতো একসময় ঘোষণা দিয়েই বসল, রাষ্ট্রের সব দলিলপত্র থেকে 'আদিবাসী' শব্দটি মুছে ফেলা হবে। নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল 'আদিবাসী দিবস' পালনে এবং কোত্থেকে একটা পুরানো রেকর্ড জোগাড় করে সেটা জোরেসোরে বাজানো হতে লাগল : "ওরা 'ইনডিজেনাস' নয়। আমরা, বাঙালিরাই, এদেশের ভূমিজ সন্তান।" অন্যদিকে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সেই কবে থেকে,



"বাংলাদেশ সরকারের ভাষ্য যে, এদেশে কোন ইনডিজেনাস জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব নেই, তা কোন জোরালো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইনডিজেনাস কথাটির অস্বচ্ছতার কারণে নয়, বরং এদেশের আদিবাসী [বা 'উপজাতীয়' নামে অভিহিত] জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যেই সরকার এই অবস্থান নিয়েছে।" কথাগুলি নেওয়া হয়েছে ১৯৯৩ সালে লেখা আমার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ থেকে। অর্থাৎ 'আদিবাসী' পরিচয়ের প্রতি রাষ্ট্রের সন্দিহান নজরদারি তখন থেকেই ছিল, যে কাজে ব্যবহার্য চশমা আমলারা প্রয়োজনমত পরিয়ে দেন ক্ষমতার চেয়ারে বসা মানুষদের চোখে। বিশ বছর আগেকার বাস্তবতার সাথে এখনকার মূল পার্থক্য একটাই, যেসব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তখন সংহতি প্রকাশ করেছিলেন আদিবাসীদের দাবী দাওয়ার প্রতি, আজ তাঁদের চোখে সেই চশমা, এবং তাঁদের মুখে সেই পুরানো রেকর্ডের গান। অনেকটা হাকিম নড়ে, কিন্তু হুকুম নড়ে না অবস্থা। তবে যে হুকুমের কথা বলছি, তার শেকড় অনেক গভীরে, যা প্রোথিত আছে জাত্যাভিমানের জমিনে, শ্রেণিস্বার্থের গভীর তলদেশে। আর সেজন্য আদিবাসীদের দীর্ঘ দুই দশকের দাবী-দাওয়া এবং সেসবের বিপরীতে দেওয়া রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, আদিবাসী পরিচয়ের ঠাঁই হয় নি সংবিধানে। সেখানে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে উপনিবেশিত মনের বিচরণভূমির একটা অংশ যেখানে উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত ক্ষমতাসীনদের মানস সন্তানরা আদিবাসী'র জমি দখল করে নিয়েছে। আদিবাসী পরিচয় যতদিন আদিমতার পোশাক পরে মিউজিয়াম ও সাংস্কৃতিক মঞ্চে, কবিতার বইয়ে, বা পর্যটনের বিজ্ঞাপনে সীমিত ছিল, শাসক গোষ্ঠী বেশ খুশিই ছিল। যেই অধিকারের প্রশ্ন উঠল, বিশেষ করে ভূমির অধিকার, অমনি ক্ষমতাসীনরা তেড়ে আসতে লাগল। এই প্রেক্ষাপটে 'আদিবাসী কবিতা'র কথা বলার অর্থ, বা 'আদিবাসী কবি'দের স্বীকৃতি দেওয়ার তাৎপর্য কি? তাদের কাজ কি শুধু 'অরণ্যের সুবাসিত ফুল' হয়ে বাংলা কবিতার আসরে বৈচিত্র্য যোগ করা? সচিবালয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত 'আদিবাসী' শব্দ আপাতত না হয় কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু তা যে হবে না, বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অনেকে করবে না, করছে না, তা কি আমরা বলতে পারি? অন্যদিকে যেসব 'আদিবাসী কবিতা' আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, সেগুলির কতটা কবিতা চাকমার "জ্বলি ন উধিম কিত্তেই!" (জ্বলে উঠব না কেন? রুখে দাঁড়াব না কেন?)-এর মত দ্রোহের আগুনে জ্বলছে, আর কতটা রাজা দেবাশীষ রায়ের কল্পিত অতীতের ধনপুদির জন্য স্মৃতিকাতর, বা ননাধনের জুম্মবির মত রোমান্টিক সৃষ্টির সান্নিধ্য কামনায় উন্মুখ? এ প্রেক্ষিতে অবশ্য একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়, তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিদের লেখা কবিতায় সমকালীন প্রসঙ্গের ছাপ অনেক বেশি স্পষ্ট। যেমন, এই নিবন্ধের শুরুতে যে ফেসবুক পোস্ট তুলে দিয়েছিলাম, সেটার প্রেক্ষিতে আলোড়ন খীসা আমাকে জানিয়েছিলেন, আমি যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলাম, তাঁর 'শংকা' নামক একটি কবিতার প্রেক্ষাপট ছিল অনেকটা একই। তাঁর দেওয়া কবিতার অংশবিশেষ হল এরকম :

এই সমস্ত রাষ্ট্রের জালিয়াতি থেকে
মুক্ত হতে হতে কোন সীমানা ছাড়াবো তা বলতে পারছি না
দেখা যাবে এইখানে আমার জন্মচিহ্ন
একদিন লুকাবে বিস্ময়ের ঘোরলাগা বাঁকে

...
আর কেউ একজন আমাকে সংগ্রহ করবে
গবেষণালব্ধ কাজে
তার কৃতিত্বের আস্তানায়, যাদুঘরে

তবে নির্বাচিত আদিবাসী কবিদের কবিতায় বিদ্রোহ, বিরহ বা প্রেম যে বিষয়ই প্রাধান্য পাক না কেন, আরেকটা বিষয় ভেবে দেখবার মত। যাদের কবিতা আমরা পড়ছি, তারা কোন অর্থে আদিবাসী? 'অরণ্যের সুবাসিত ফুল' ধরনের গ্রন্থে যাঁদের কবিতা আছে, তাঁদের মধ্যে রাজা থেকে শুরু করে মন্ত্রী, অধ্যাপক, আমলা, সামরিক কর্মকর্তা, প্রবাসী, এনজিও কর্মকর্তা বিভিন্ন পেশার মধ্যবিত্ত নারী পুরুষদের বেশ প্রাধান্য দেখা যায়, যাঁদের সাথে আর্থসামাজিকভাবে ভূমির অবিচ্ছেদ্যতা আর নেই। কাজেই সে অর্থে তাঁরা 'আদিবাসী' অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত নন। আমিও এই দলেই পড়ি। সেজন্যই নিজেকে আমি প্রশ্ন করি, আমার লেখা কোন কবিতায় আমার ব্যক্তিক বা শ্রেণিগত আচ্ছন্নতাকে ছাপিয়ে সামষ্টিক 'আদিবাসী কণ্ঠস্বর' ফুটে ওঠার সুযোগ ও সম্ভাবনা কতটুকু আছে? আবার 'আদিবাসী কণ্ঠস্বর' বলে সমরূপ, অবিভাজ্য কিছু আছে কি? কথা আরো আছে, থেকে যায়। যেমন, ক্ষমতার পাশাপাশি বাণিজ্যের সাথে কবিতা ও শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্ক কী? সচিবালয় থেকে যেমন, তেমনি বাংলা বাজার বা কাওরান বাজারের মত জায়গা থেকে বাংলা একাডেমি, শহিদ মিনার বা শাহবাগের মত জায়গার দূরত্ব কতটুকু? এ ধরনের প্রশ্ন আসলে ইতোমধ্যেই অনেকেই তুলেছেন, যাদের কাছে 'আদিবাসী' পরিচয়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে আড়াল করার প্রচেষ্টার সমান্তরালে কর্পোরেট মিডিয়ায় সেটিকে নূতন পোশাকে হাজির করার প্রবণতা নজর এড়ায় নি। যেমন, আমার পূর্বোক্ত ফেসবুক পোস্টের উপর করা একজনের মন্তব্য ছিল এরকম :

> আসলে আমাদের দেশের মিডিয়াগুলিও 'আদিবাসী' সম্বোধনটি ব্যবহার করে সিন্দাবাদের মত বাণিজ্যে নামে। যেটা আলাদা [স্বাদ দিয়ে] দর্শক/পাঠক/শ্রোতা সবাইকে সম্মোহিত করে বড় একটা বাণিজ্য করে নিয়ে যায়। অথচ সত্যিকারই যারা নিজের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করছে তারা বংশ পরম্পরায় কেবল লড়াই করেই চলছে! [চাঙমা নিকোলাই]

৪।

উপসংহার : যে বৃত্ত ভাঙতে হবে

উপরে যে ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আসা হয়েছে, সেরকম আরো অনেক প্রশ্ন তোলা যায়, তোলা দরকার। তবে এসব প্রশ্ন তোলার একটা অর্থ হবে কবিতা লেখার বদলে এক ধরনের উত্তর-আধুনিক বিপন্নতায় আক্রান্ত হওয়া, যে বিপন্নতা আর প্রান্তিক কোন আদিবাসী কৃষকের অস্তিত্বের সংকট চরিত্রগতভাবে ঠিক এক নয়। আর তা নয় বলেই কবি-পাঠক-সমালোচক সকলের দিক থেকে এসব ব্যাপারে, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে 'আদিবাসী' নামক ঢালাও কোন বর্গ (বা বৃত্ত) ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা কাম্য। নতুবা কবিতার পাঠ খুব খণ্ডিত, এমনকি ভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমার লেখা 'নির্বাসিত শব্দমালা' কবিতার একটা বয়ান,



যা এক বন্ধুর সৌজন্যে সম্প্রতি আমার চোখে পড়েছে, তুলে ধরছি একটা উদাহরণ হিসাবে। প্রথম আলোতে প্রকাশিত 'জীবিত ভাষার মরণযাত্রা : বহু ভাষার বাংলাদেশ' (০৩-০২-২০১২, ইন্টারনেট সংস্করণ) শীর্ষক একটা প্রতিবেদনে এম এ মোমেন আমার কবিতার কিছু অংশ একটা জায়গায় একটু ভুলভাবে উদ্ধৃত করে ততোধিক ভুল ব্যাখ্যা করে বসে আছেন (তিনি আমার কবিতা কোথায় পড়েছিলেন উল্লেখ করেন নি। হয়তবা প্রথম আলোতে ছাপা হয়েছিল, কারণ 'অরণ্যের সুবাসিত ফুল'-এর অনেক কবিতা নাকি সেখানে ধারাবাহিকভাবে ছাপানো হয়েছিল।)। বাংলার অবস্থা পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার চেয়ে ভালো, অন্তত আদিবাসী ভাষাগুলোর চেয়ে তো বটেই, নতুবা আদিবাসী কবি তাঁর মাতৃভাষা ছেড়ে বাংলায় কবিতার চর্চা করতেন না। প্রশান্ত ত্রিপুরা 'নির্বাসিত শব্দমালা'র জন্য আর্তনাদ করছেন বাংলাতেই। আদিবাসী কবি হিসাবে আমাকে বৃত্তবন্দী করার কারণে 'নির্বাসিত শব্দমালা'র যে (অনভিপ্রেত) অর্থ দাঁড় করানো হয়েছে, তা দেখে আমি কিছুটা কৌতুক বোধ যেমন করেছি, তেমনি আরো বেশি স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেছি কেন এমন বৃত্ত ভাঙা দরকার।

শেষ করব কিছু কথা বলে যেগুলো কিছুটা গৎবাঁধা শোনাতে পারে (সেক্ষেত্রে কেউ যদি মনে করেন কথাগুলোর পেছনকার অনুমানগুলোকে সামনে নিয়ে আসা দরকার, আমার তাতে পূর্ণ সায় থাকবে)। আমি বিশ্বাস করি, কবিদের মন চায় না শৃঙ্খল মানতে, বা কোন কবুতরের খোপে বাসা বাঁধতে। বড়জোর পদ্যের শৃঙ্খল হয়ত কবিরা মেনে চলতেন এককালে, তাও সেটা অনেককাল আগেকার কথা। রাজনীতির ছক মেনে কবিতা খুব বেশিদূর আগাতে পারে নি তেমন কোথাও। আবার কবিমন বাঁধা থাকতে চায় না সংসারের বৃত্তেও। কবি মানেই ব্রাত্যজন, বাউল। কবিতার কারবার প্রেম আর দ্রোহ নিয়ে। তার কাজ সীমানা তৈরি নয়, বরং সীমানা ভাঙা। কাজেই 'আদিবাসী কবি বা কবিতা'র বৃত্ত ভেঙে ফেলা খুব জরুরি। আমি প্রথম আঘাতটা করলাম। বাকিটা করতে হবে আপনাকে, যিনি এ লেখা পড়ছেন আপনার পরিচয় কবি, পাঠক, সমালোচক, যাই হোক না কেন।

# আদিবাসীদের বিকাশ এবং ব্যাপারীদের bKash

## পাইচিংমং মারমা

**সোজা হিসাব**

কে কে পাহাড়ের আদিবাসী সংস্কৃতির বিকাশ চান?
নিশ্চয় সবাই চান। এবার বলুন : কে কে পাহাড়ে পর্যটনের প্রসার চান?
অনেকেই চান। কেন চান?

আপনারা বলবেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। মানুষের আয় রোজগার বাড়বে। এলাকার উন্নয়ন হবে। দূর্গম অঞ্চলে রাস্তাঘাট হবে। আমরা আধুনিক দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবো। আমরা নেংটি ছেড়ে জিন্সের প্যান্ট পরবো। আমরা উন্নত হবো... ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার বলুন, পাহাড়ের শহর-জনপদে মদের জোয়ার কে কে চান? কে কে খাগড়াছড়ি-বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটিতে ব্যাপক হারে মদের প্রচলন চান? কে কে চান আপনার গ্রামের অভাবী মেয়েটা বেশ্যা হোক? আদিবাসী সমাজের নৈতিকতা-সংস্কৃতি ধ্বংস হোক কে চায়? আদিবাসীদের লোকজ সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাক কে চায়? আমাদের জীবন, আমাদের সংস্কৃতি সব কিছু শোকেসে সাজানো পণ্যের মতো প্রদর্শনী হবে। তারপর আমরাও পণ্য হবো আর আমাদের প্রদর্শনীর টাকা খাবে ব্যাপারীরা- বলুন কে কে চান? নিশ্চয় কেউ চান না।

আপনি চান বা না চান বাংলাদেশ রাষ্ট্র চায়। খোলাসা করে বললে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতি এটাই চায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনীতির যে কারবার সেই নিয়মে আমাদের পণ্য করা হবে। ব্যাপারটা খুলে আলোচনা করা যাক। একটু বোরিং লাগবে। আমি আমার উপলব্ধিটা সহজ করে বলার চেষ্টা করবো।

বান্দরবানে আজকাল প্রচুর পর্যটকের ভিড় হয়। বান্দরবান যদি পর্যটনের স্বর্গ হয় তাহলে কী লাভ ক্ষতি একটু ভাবা যাক।
বান্দরবান পর্যটন স্থান হলে কার কার লাভ হয় :
হোটেল-লজ-রিসোর্টের মালিক,
হ্যান্ডিক্রাফটস (হস্তশিল্প পণ্য– কাপড়, আদিবাসীদের তৈজসপত্র ইত্যাদি),
মদের দোকানদার,
বেশ্যা আর বেশ্যার দালাল,



পরিবহন কোম্পানি,
খাবারের হোটেলের মালিক,
শহরের ভিড়ভাট্টা হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের যোগানদার- মার্কেট, বাজারের পাইকারী ও খুচরা দোকানদাররা।
-অর্থাৎ এক কথায় পর্যটনের সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীরা।
যারা বান্দরবানের সাধারণ মানুষ- জুম চাষী, মধ্যবিত্ত, বিভিন্ন অফিসের কর্মচারি তাদের কী লাভ? তাদের কোন লাভ নেই।
এখন বান্দরবানের হোটেল-রিসোর্টের মালিক, পরিবহন ব্যবসায়ী, পর্যটন স্থান (নীলগিরি, নীলাচল ইত্যাদি), পাইকারী ব্যবসায়ী কারা?
-অবশ্যই আদিবাসীরা নয়। এরা সবাই পাহাড়ের বাইরের মানুষ যারা মূলত ব্যবসায়ী। এরা ব্যবসা করার উদ্দেশ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছে।
কিন্তু বেশ্যা এবং বেশ্যার দালাল, মদের দোকানী, কিছু খাবার হোটেলের মালিক কারা?
-বান্দরবানের আদিবাসীরা।
*তাহলে সোজা হিসাবে আমরা কী পেলাম? পর্যটনের ফলে আমরা পেলাম বেশ্যাবৃত্তি, আদিবাসী জনপদে মদের বন্যা, ফটকা ব্যবসায়ী যারা আদিবাসী নয়, সমাজে নৈতিকতা ও সংস্কৃতির অবক্ষয়, আদিবাসীদের পণ্যায়ন বা আদিবাসীদের পণ্যে পরিণত হওয়া।*
*পর্যটকের আকর্ষণীয় জিনিষগুলো কী কী?*
*-প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থান, আদিবাসী সংস্কৃতি যা কৌতূহলী পর্যটকের অচেনা, আদিবাসীদের তৈরি মদ ।*
বান্দরবানসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সমাজে মদ্য পান করাটা অপ্রচলিত নয়। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে এর প্রচলন আছে। মদ্য পানের জন্য এমনিতেই আমাদের সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়। যদি এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয় অর্থাৎ মদ পান এবং বেচাকেনা যদি সমাজে বেশি প্রচলিত হয়ে যায় এবং তা যদি প্রশাসনের সম্মতিক্রমে হয় তাহলে?
গোটা সমাজের নৈতিকতা, ভারসাম্য, শৃংখলা ভেঙে পড়বে।
আমার উপরের বক্তব্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কী?
& প্রতি বছর রাজ পুন্যাহের সময় বান্দরবানে কী দেখা যায়?

১. গলির ভেতরে সারি বাঁধা "ডাব্বা" খেলা বা জুয়ার পসরা।
২. পর্দার আড়ালে বা বাইরে মদের সহজলভ্য বেচাকেনা। একটু অভাবী সংসারের ঘর হয়ে যায় মদের দোকান।
৩. শহর থেকে পর্যটনে আসা বাবুদের খাঁই মেটাতে অভাবী ঘরের মেয়েটা রাস্তায় নামে শরীর বেচতে। একজন আদিবাসী মারমা মেয়ে বেশ্যা হয়ে যায়।
৪. ধান্দাবাজ যুবক হাওয়া বুঝে মৌসুমি ব্যবসা ধরে। চাঁদা ধরা, ফাটকাবাজি, এটা-ওটার দোকান দেওয়া ইত্যাদি। তাতে করে তার বেকারত্ব ঘুঁচে না কিন্তু পরিণতিতে তার ভেতরে দালাল প্রবৃত্তি গড়ে উঠে।

**আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক**

বান্দরবানসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটন শিল্পের বিকাশ হলে আমার-আপনার মতো সাধারণ আদিবাসীর এক পয়সা লাভ নেই। কেননা পর্যটন শিল্পের সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই। এখানে আমাদের মাতৃভূমি পাহাড়ের নিসর্গ, আমাদের জীবনধারা-সংস্কৃতি দেখিয়ে কিছু মানুষ টাকা কামাচ্ছে আর অন্যদিকে আমাদের সমাজ নষ্ট হচ্ছে। আমাদের সমাজে বেশ্যাবৃত্তি, মদের প্রচলন বাড়ছে। অসাধু উপায়ে টাকা কামানোর দালাল শ্রেণী তৈরি হচ্ছে। আমাদের এবং আমাদের পাহাড়কে দেখিয়ে পর্যটক আকৃষ্ট করে এখানে এনে আমাদের পণ্য বানানো হচ্ছে। পর্যটক আকৃষ্ট করতে আমাদের প্রদর্শন করা হচ্ছে, আমাদের সংস্কৃতিকে পণ্য বানানো হচ্ছে।

চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষ গত কয়েক বছর ধরে পার্বত্য আদিবাসীদের নিয়ে লোকজ মেলা আয়োজন করে আসছে। এ বছর পঞ্চমবারের মতো "পর্যটনের বিকাশে, পার্বত্য অঞ্চলকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরার লক্ষ্যে কয়েক হাজার পার্বত্য শিল্পী নিয়ে বিশাল আয়োজন" করেছিলো তারা।

কিন্তু কেন?

"আনন্দ কি আনন্দ এসে গেছে  কোকাকোলা

গেছে সব দেনার দায়ে বাকি আছে কাপড় খোলা"

নচিকেতার এই গানটা আমাদের প্রেক্ষাপটে ভাবা যাক। আমরা কেউ ব্যবসায়ী নই। গুটিকয়েক আছেন খুচরা ব্যবসায়ী। বড় কোন বিনিয়োগ যেমন পরিবহন, রিসোর্ট, শিল্প কারখানা আমাদের দিয়ে হবে না। কারণ আমরা যুগ যুগ ধরে জুম চাষ করে আসছি। কয়েক দশক হলো আমাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয়েছে। যারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তারাও চাকরিবাকরি করেন, ব্যবসা নয়। রাঙ্গামাটিতে কয়েকজন কুটিরশিল্প আর হস্তশিল্পের মালিক আছেন তাও উল্লেখযোগ্য নয়।

আপনার শহরের সব বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো কারা চালায়? দেশের অর্থনীতির স্থানীয় সঞ্চালক কারা?

-আমি, আপনি বা আমাদের মতো আদিবাসীদের কেউ নই। সুতরাং পর্যটন শিল্পের বিকাশ হওয়া বা না হওয়াতে আমাদের কিছু যায় আসে না। সুতরাং এই শিল্পের বিকাশে আদিবাসীদের কোন লাভ নেই।

তাহলে আমাদের পাহাড়ে পর্যটন শিল্পের বিকাশ করতে কিছু মানুষের এত উৎসাহ কেন? এরা কারা?

এরা কেউ আমাদের মতো সাধারণ খেটে খাওয়া, চাকরি করে জীবিকা উপার্জনের কেউ না। যেমন ধরুন চ্যানেল আই। তাদের এত কিসের ঠ্যাকা পড়লো আমাদের সংস্কৃতি উন্নত করতে?

কারণ এখানেই তাদের লাভ। ওরা আমাদের দেখিয়ে পয়সা কামায়। ওরা মিডিয়ার লোক। অনুষ্ঠান তৈরি করে ওরা কোটি কোটি টাকা কামায়। আমাদের সংস্কৃতি প্রদর্শনের নামে ওরা



একেকটা অনুষ্ঠান বানাবে (event creation)। সেই অনুষ্ঠানে বিজ্ঞাপন বাবদ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ওরা লাখ লাখ টাকা কামাবে, পার্টনার এজেন্সি এবং প্রোমোটারের কাছ থেকেও পয়সা কামাবে। আর এই লক্ষ-কোটি টাকার কিছু উচ্ছিষ্ট ভাগ দেবে আমাদের শিল্পীদের পারিশ্রমিক হিসাবে। আমাদের সংস্কৃতি বাঁচলো কি মরলো তাতে তাদের মাথা ব্যথা নেই। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যবসা। ওদের ব্যবসার সাথে আরও অনেকের ব্যবসা জড়িত। তারা চায় এখানে চ্যানেল আইয়ের মতো মিডিয়ার কার্বারিরা ঢুকুক।

খেয়াল করুন, ওরা আমাদের সংস্কৃতির কোন অংশটাকে প্রচার করে- মারমাদের সাংগ্রাই, জল উৎসব এবং উৎসব সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানাদি। অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতির উৎসবের দিকটাকে ওরা তুলে ধরে। এখানে "বিশেষভাবে" উৎসবের বাহ্যিক অংশ যেমন পাখা নৃত্য, কলসি নৃত্য, পানি খেলা ইত্যাদিকে দেখানো হয়। যেকোন সামাজিক উৎসবের অনেক দিক থাকে। সামাজিক উৎসবের ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক গুরুত্বকে (যা উৎসবের মর্মবস্তু) বাদ দিয়ে শুধু উৎসবের প্রকাশ বা উচ্ছ্বাসের (উৎসবসর্বস্বতা) মানে উচ্ছৃংখলতা। আরো খোলামেলা করে বলা যাক। এর বিশদ ব্যাখ্যা পরের অংশে দেওয়া আছে। পড়াশোনা এবং চাকুরিসূত্রে আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে দশ বছর ছিলাম। আমাদের অফিসে একমাত্র মারমা ছিলাম আমি। একবার কাজের দরকারে গিয়েছিলাম আরেকটা বিভাগে। সেখানকার কর্মকর্তা আমার সাথে পরিচিত হয়ে বললেন, "আচ্ছা আপনি তো মারমা। আপনাদের প্রধান উৎসব তো সাংগ্রাই, তাই না? ঐ সময় আপনারা পানিখেলা করেন, ঠিক না? আমি টি ভি তে দেখেছি।" সেই কর্মকর্তার সাথে যে অভিজ্ঞতাটা হলো একইরকম অভিজ্ঞতা অসংখ্যবার হয়েছে। সেই কর্মকর্তা একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁর কাছে মারমা আদিবাসী মানে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী, অশিক্ষিত উপজাতি যারা উৎসব প্রিয়, যারা সাংগ্রাই করে, জলকেলি করে। বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মানুষের মধ্যে আমাদের বিষয়ে এরকমই ধারণা। বাংলাদেশের মিডিয়া এভাবেই আমাদের বাঙালিদের কাছে তুলে ধরে। কিন্তু তারা তুলে ধরে না-

আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রাম।

আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, প্রথা, সামাজিক আচার-বিচার, নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধ। মুসলিম বাঙালি সমাজের তুলনায় আমাদের সমাজে নারীদের অবস্থান উঁচুতে। নারীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি মিডিয়াতে দেখানো হয় না।

দেখানো হয় না আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠান এবং উৎসবের সামাজিক গুরুত্ব, ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।

রাষ্ট্র কর্তৃক আমাদের শোষণ বঞ্চনা, গণহত্যার ইতিহাস। মনে করে দেখুন আমাদের পাহাড়ে এত গণহত্যা হলো, আমাদের এত আত্মীয়-স্বজন মারা গেলো, আমরা দেশান্তরী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমাদের জমি-পাহাড় আমাদের জন্মভূমি সেটেলারদের আগ্রাসনে বেদখল হয়ে যাচ্ছে। তার এক সেকেন্ড খবর কি কখনো মিডিয়ায় দেখেছেন? প্রতি বছর পাহাড়ে রাষ্ট্রীয়

মদদে সেটেলারদের হাতে আদিবাসীদের ভূমি বেদখল হয়ে যায়। বাংলাদেশের মিডিয়া কি সেই কথা বলে? বছর বছর আমাদের ঘর পুড়ে সেটেলারদের আগুনে। সেই কথা কি মিডিয়া বলে? পাহাড়ের আড়ালে আদিবাসীদের কান্না পাহাড়ের পাথুরে গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়। বাংলাদেশের মিডিয়া সেই কথা বলে না। সেটেলারদের হাতে লাঞ্ছিত হয় আমাদের মা-বোনেরা, মিডিয়া কি সেই কথা বলে?

-বলে না। মিডিয়া এই ক্ষেত্রে টুঁ শব্দটা করে না। তাহলে মিডিয়া কেন আমাদের আমোদ-ফুর্তিবাজ হিসাবে দেখাতে চায়? কেন আমাদের জনপদে মদের বন্যা ঘটাতে চায় রাষ্ট্র, প্রশাসন, মিডিয়া? প্রশ্নগুলো সহজ, উত্তর তো জানা। কারণ তারা আমাদের জনপদকে থাইল্যান্ডের অনুকরণে সেক্স ট্যুরিজমের দেশ বানাতে চায়। লাস ভেগাসের মতো জুয়া-মদ-যৌনতার রাজধানী বানাতে চায় যেখানে দেশ বিদেশের পর্যটকেরা ফুর্তি করতে আসবে। নগরজীবনে ক্লান্ত শহরের বাবুরা এখানে আসবে ক্লান্তি দূর করতে, আদিবাসী মেয়েছেলে আর সুরার সাগরে ভাসতে। আমাদের উপরে রাষ্ট্রীয় শোষণের খড়্গ নেমেছে কয়েক দশক হলো। সেই খড়্গে বলি হয়েছে অগণিত আদিবাসী। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এই স্বাধীন দেশে গণহত্যা হয়েছে। আর সেই গণহত্যায় শত শত আদিবাসীকে হত্যা করা হয়েছে। আদিবাসী নিধনের হাত থেকে বাঁচতে যারা শরণার্থী হয়ে ভারতে পালিয়েছিলো তারা ফিরে এসে দেখে তাদের ভিটেমাটিতে এখন সেটেলারদের বাড়-বাড়ন্তবসতি। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের মাটি, আমাদের লোকালয়, আমাদের নারী, আমাদের অস্তিত্ব কিছুই আর নিরাপদ নয়। আমরা আদৌ নিশ্চিত নই যে আমরা আগামী কুড়ি বছর পর আমাদের ভিটেমাটিতে নিরাপদে থাকতে পারবো কিনা। রাষ্ট্র এভাবেই আমাদের শোষণ করে চলেছে। পাহাড়ে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটানো আসলে আমাদের শোষণের নতুন পদক্ষেপ। পাহাড়ে পর্যটন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে আদতে রাষ্ট্র আমাদের প্রান্তিকতার শেষ সীমায় ঠেলে দিতে চায়। পর্যটনের ফলে আমাদের পণ্য বানিয়ে রাষ্ট্র আমাদের বেচতে চায়। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের নৈতিকতা-সামাজিক শৃঙ্খলা, সামাজিক মানুষ হিসাবে ব্যক্তিক আত্মমর্যাদাবোধ- সব কিছু ধ্বংস করতে চায়। যাতে আমরা হয়ে যাই চিড়িয়াখানার প্রাণীর মতো দর্শনীয় উপজাতি, ভোগ করার মতো নারীমাংস, ধ্বংসম্মুখ-বিলুপ্তপ্রায় উপজাতি।

**উচ্চতর শোষণতন্ত্র**

প্রশ্ন হচ্ছে পাহাড়ে বিশেষভাবে পর্যটনশিল্পের বিকাশ কেন? কেন এত শিল্প থাকতে পর্যটনশিল্পকেই বেছে নেওয়া হলো? রাষ্ট্র যদি আমাদের জীবনমান উন্নয়নে এখানে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে চায়তো তাহলে প্রথমেই পর্যটনশিল্পকে বেছে নিতো না। পর্যটন শিল্পের বদলে কৃষি শিল্পের বিকাশ করতো। কেননা আমাদের জুম্মরা যুগের পর যুগ ধরে জুম চাষ করে আসছে। এখানে প্রচুর কৃষি উৎপাদন হয়। এখানকার অনেক কৃষি উৎপাদন ভৌগোলিক কারণে স্বতন্ত্র উৎকর্ষে অনন্য যেমন- কমলা, আদা, হলুদ, কলা, আনারস ইত্যাদি। সরকার



বা রাষ্ট্র যদি একান্তই আমাদের মঙ্গলচিন্তায় শিল্পের বিকাশ চাইতো তাহলে এখানে সর্বপ্রথম কৃষি শিল্পের বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ নিতো। শিল্প বিকাশের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উদ্যোক্তা ও পুঁজির বিকাশ, শিল্প বিকাশের প্রতিবন্ধকতা নিরসন যেমন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আবশ্যক। তাহলে শিল্প বিকাশের পূর্বশর্ত পূরণ না করে কেন এখানে পর্যটন শিল্পের বিকাশ চায় রাষ্ট্র? কেননা রাষ্ট্র উন্নয়ন চায়। এখানে পর্যটনশিল্পের বদলে অন্য শিল্পের বিকাশ যাতে আদিবাসী সমাজের ক্ষমতায়ন হয় এমন কিছু রাষ্ট্র করতে পারে না। কেননা বাংলাদেশ একটি বুর্জোয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এই উন্নয়নের স্বার্থে কিছু "উপজাতীয়" সমাজের ক্ষতি প্রকারান্তরে রাষ্ট্রের জন্যই লাভজনক। কেননা সমাজে নীতি-নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও সমাজের মানুষের মর্যাদাবোধ যদি সমুন্নত না থাকে সেই সমাজের মানুষকে দিয়ে নৈতিক সংগ্রাম বা অধিকারের লড়াই সম্ভব নয়। লুম্পেন, দালাল, সুবিধাবাদী জনগোষ্ঠী দিয়ে আর যাই হোক গণমুক্তির লড়াই অসম্ভব।

সামাজিক উৎসবের ঐতিহ্যগত প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক গুরুত্বকে (যা উৎসবের মর্মবস্তু) বাদ দিয়ে শুধু উৎসবের প্রকাশ বা উচ্ছ্বাসের উৎসব সর্বস্বতাকে কেন সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে? কেননা এখানে সামাজিক গুরুত্বের চাইতে অর্থনৈতিক গুরুত্বটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ে কর্পোরেট হাউজগুলো বাংলাদেশের অনেক "বাঙালি সংস্কৃতির উৎসবে" পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। যেমন : লালন মেলা, মধু মেলা, নৌকা বাইচ ইত্যাদি। একইভাবে তারা মারমাদের সাংগ্রাই উৎসবে স্পন্সর করে। আর মিডিয়া সাংগ্রাইয়ের পানিখেলাকে বেশি ফোকাস করে। বাঙালি সংস্কৃতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক তারা পৃষ্ঠপোষকতা করে না। খেয়াল করলে দেখা যাবে তারা সেই অনুষ্ঠানকেই স্পন্সর করে যেখানে লোকসমাগম বেশি। কেননা, বেশি লোক মানেই বেশি ক্রেতা যাদের কাছে তারা নিজেদের পণ্য ঢোকাতে পারবে। এখানে তাদের সংস্কৃতিপ্রীতি বা "সি এস আর" (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি) একটা গৌণ বিষয়, বড় বিবেচ্য হচ্ছে তাদের বাজার সম্প্রসারণ, পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ভোক্তার কাছে বড় করা। একই কারণে বাঙালি সংস্কৃতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিন পালন না করে কর্পোরেট মিডিয়া এবং কর্পোরেট হাউজগুলো পয়লা বৈশাখকে সামনে নিয়ে আসে। এভাবে বাঙালি সংস্কৃতির পয়লা বৈশাখ হয়ে যায় "গ্রামীণ ফোন পয়লা বৈশাখ" যার লাইভ টেলিকাস্ট করে টিভি চ্যানেলগুলো।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় কর্পোরেট স্বার্থে সংস্কৃতি পাল্টে গিয়ে কর্পোরেট সংস্কৃতিতে রূপ নেয়। সেই কর্পোরেট সংস্কৃতি ঢুকে যায় মানুষ নামের ভোক্তার ডাইনিং টেবিলে, কিচেনে, বেডরুমে। একইভাবে আদিবাসী সংস্কৃতি প্রভাবশালী, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রভাবে যখন বিলুপ্তপ্রায় তখন মিডিয়ার কারণে মানুষের সামনে চলে আসে সাংগ্রাই-এর পানিখেলা। কেননা এর একটা appeal আছে। জলসিক্ত মারমা তরুণী মিডিয়ার কল্যাণে টিভিতে চলে আসে আর ওদিকে হারিয়ে যায় মারমাদের শতবর্ষের সমৃদ্ধ অনেক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ট্যুরিজমের সাথে এর সংযোগটা বিবেচনা করতে হলে আমরা ব্রাজিলের কথা ভাবতে

পারি। ব্রাজিলের রয়াল কার্নিভাল আর সাম্বা নাচ। ব্রাজিলের কার্নিভাল আর সাম্বা নাচ ব্রাজিলকে ছাপিয়ে গোটা বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে। প্রতিবছর কার্নিভালের সময় পতিতাবৃত্তি বেড়ে যায় স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বহুগুণ। Council on Hemispheric Affairs (COHA) এর গবেষক *Melissa Beale* এর মতে "The commercial view of Brazil is that it is a country of samba, football and carnival. Unfortunately, many tourists visit the breathtaking country not for its culture, but for its renowned reputation of exotically striking people and as a center of personal freedoms. This erotic picture of Brazilians has gained negative attention from inappropriate tourists seeking sexual experiences abroad, whether or not it is consensual or legal, – thus, the sex tourism begins."

একইভাবে রাষ্ট্রের আদিবাসী হিসাবে মারমাদের ঐতিহ্যগত স্বকীয় অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্বীকার না করে তার উৎসবসর্বস্বতাকে প্রচারের মধ্যেও একটা দূরভিসন্ধি আছে। রাষ্ট্র কি তাহলে চায় যেন পর্যটকেরা পানিখেলা, আদিবাসী নারীর নৃত্য আর উৎসব দেখতে পাহাড়ে ছুটে আসুক? ব্রাজিল কার্নিভাল, সাম্বা নাচ আর পতিতাবৃত্তির ডলারে দেশের "উন্নয়ন" করে। সেভাবে বাংলাদেশের সরকারও কি চায় "উপজাতীয়দের মদ, উপজাতীয় নারীর নাচ, উপজাতীয়দের উৎসব আর পানিখেলায় জলসিক্ত যৌনাবেদনময় নারীর" আকর্ষণে এখানে আরেকটা ব্রাজিলীয় কায়দায় উৎসবমুখর পরিবেশে আদিবাসীদের বিক্রি করা হোক? এনজিওরা নিজেদের উন্নয়ন সহায়ক বা উন্নয়নকর্মী বলে দাবি করেন। তাদের কাছে "উন্নয়ন" শব্দের বহুমাত্রিক এবং অনেক ভারী ভারী সংজ্ঞা আছে। সরকারসহ আন্তর্জাতিক "উন্নয়ন সহযোগী" যেমন বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বাতলে দেওয়া উন্নয়ন ধারণা দরিদ্র দেশের কাছে এক মায়ামৃগ যার পেছনে বাংলাদেশের মতো রুগ্ন অর্থনীতির দেশ নিরন্তর ছুটছে কিন্তু নাগাল পাচ্ছে না। এতসব বাঘা বাঘা পণ্ডিতের উন্নয়ন নিয়ে মাথা ঘামানো দেখে মনে হয় উন্নয়ন যেন এক প্রপঞ্চ। বৈশ্বিক নীতির নির্ধারক যারা, যাদের প্রেসক্রিপশনে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয় তারাই ঠিক করে দেন উন্নয়ন কীভাবে হবে, কাদের হবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা যায় গরিবী দূর করার জন্য যত বিদেশী টাকা এদেশে আসে তার সিংহভাগ ক্ষমতাসীনের মন্ত্রণালয় এবং ক্ষমতার কাছাকাছি মানুষেরা ভাগযোগ করে গিলে খায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নয়ন মানে বিশেষ শ্রেণির উন্নয়ন। ধনিক শ্রেণির উন্নয়ন। উদোমবাজারি-কানাবাজারি কারবারে ধনী আরো ধনী হয় আর গরীব আরো গরীব হয়। পর্যটন শিল্প তেমনই এক মায়ামৃগের কারবার এবং মুনাফা শিকারের মৃগয়া যেখানে আদিবাসীরা শিকারে পরিণত হবে। পুঁজিবাদী উন্নয়নের অন্যতম সূচক হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। সোজা হিসাবে জিডিপি বাড়লে অর্থনীতির আয়তন বাড়বে, ফলস্বরূপ তার প্রবৃদ্ধি বাড়বে। এখন জিডিপি বাড়ানো এবং গড় আয় বৃদ্ধি একটা শুভঙ্করের ফাঁকিবাজী যেখানে একজন এক টাকা রোজগারের মানুষ আর আরেকজন ১০০ লক্ষ টাকা আয়ের মানুষের আয় ভাগ করে গিয়ে দাঁড়ায় জনপ্রতি ৫০ লক্ষে। কোথায় ১ টাকা আর কোথায় ৫০ লক্ষ! যাই





হোক, সরকার তথা রাষ্ট্র জিডিপিতে পর্যটনের অংশটা বাড়াতে চান। কিন্তু সব সম্ভবের দেশে কিছু বুমিং (Booming) শিল্প খাতে কি দেখা যায়? বাংলাদেশে প্রধান রপ্তানি আয় আসে গার্মেন্টস থেকে। শ্রমিকের শ্রম নিংড়ে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বাড়ে কিন্তু সেই শ্রমিকের কি হাল? এখানে প্রতি ঘণ্টায় ন্যূনতম মজুরি ০.১২ ডলার যা বিশ্বের যেকোন দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। কমপ্লায়েন্স ও শিল্প আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কারখানায় ন্যূনতম নিরাপত্তা রাখা হয় নি। পরিবেশের তেরোটা বাজিয়ে জাহাজ ভাঙার শিল্পে আনা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যে ঠাসা জাহাজ আর শ্রমিকের শ্রম অমানবিকভাবে নিংড়ে বাড়ানো হচ্ছে দেশের জিডিপি। অবশ্য কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সবকিছুই জায়েজ। কেননা প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে গেলে গরিবের শ্রম নিংড়াতেই হবে এবং পরিবেশ দূষণের কথা ভাবা চলবে না। সুতরাং সুযোগ ব্যয় তত্ত্বের ফাঁদে শ্রমিকের শ্রম নিংড়াতেই হবে। সুতরাং প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হলে আদিবাসীদের বলি দিতেই হবে। বিনিময়ে আদিবাসী সমাজের কি ক্ষতি হলো তাতে রাষ্ট্রের চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। ANITA PLEUMAROM একজন ভূতত্ত্ববিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। তিনি South-East Asia Tourism Monitor নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক এবং ব্যাংকক ভিত্তিক Tourism Investigation & Monitoring Team (tim-team) সংগঠনের সমন্বয়ক। তাঁর মতে পর্যটন শিল্প "একধরনের উন্নয়ন আগ্রাসন"(development aggression) অর্থাৎ উন্নয়নের মোড়কে আগ্রাসন। কেন তিনি পর্যটনকে আগ্রাসনের সাথে তুলনা করেছেন? তিনি বলেন, "Women in tourism are found to have the most dehumanising and the worst-paid jobs. Tourism has an infamous reputation of boosting the sex industry wherever it takes root. Efforts to make industry comply with the Code of Ethics promoted by the UNWTO have not helped to curb trafficking in women and girls for sex work in tourist destinations, which in many cases deprives the victims of their fundamental human rights and exposes them to health risks such as HIV/AIDS. Industry self-regulation has proven an utterly inadequate tool in tourist centres, such as Pattaya in Thailand, Cancun in Mexico or Johannesburg in South Africa, where the sex, drugs and crime, gang violence, mafia-style politics and corruption are out of control. The erosion of culture and traditional values is visible in all tourist destinations driven by over-commercialisation. Even many of the UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)'s World Heritage sites are not properly protected from privatisation and 'Disneyfication'. Tourism - including 'ecotourism' - also exploits indigenous and local communities and their cultures, turning them into mere exhibits for tourists' entertainment."

এখানে তিনি থাইল্যান্ডের শিক্ষা থেকে উপরের কথাগুলো বলেছেন। প্রসঙ্গতঃ ব্রাজিলের মতো থাইল্যান্ডও একটি সেক্স ট্যুরিজমের দেশ। পর্যটন বিষয়ে বহু গ্রন্থের প্রণেতা Deborah McLaren বলেন যে, "Global tourism threatens indigenous knowledge and intellectual property rights, our technologies, religions, sacred sites, social structures and relationships, wildlife, ecosystems, economies and basic rights to informed under-

standing; reducing indigenous peoples to simply another consumer product that is quickly becoming exhaustible."

**পরিশেষ**

লেখার শুরুতেই আমি ঠিক করেছিলাম যে এই লেখাটা খুব সহজবোধ্য করে লিখবো। যাতে আমার লেখা আদিবাসী সমাজের সবাই বুঝতে পারেন। সমাজবিজ্ঞান, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও ইতিহাসের আলোকে দেখানো যায় পাহাড়ে পর্যটনের ফলে আদিবাসীদের জীবনে কী বিপর্যয় হতে পারে। সেই বিশ্লেষণী লেখা আমি ভবিষ্যতে উপস্থাপন করবো। আমার লেখা আরো বিশ্লেষণী এবং ভারী করা যেত। কিন্তু আমি চাইনি আমার লেখা কোন থিসিস পেপার হোক। আমি চাই আমার এই লেখা একটা লিফলেটের মতো হোক, একটা হ্যান্ডবিলের মতো হোক যাতে সবাই এই লেখা পড়ে সচেতন হতে পারে। এই লেখার প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে নীচে দেওয়া ওয়েব লিঙ্কে আরো প্রবন্ধ আছে। আমি আমার লেখায় ঐ সব কথার সারকথা বলতে চেয়েছি। বাংলাদেশের Economic Trend, Industrial Analysis, Industrial Feasibility and profitability Analysis করে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে পাহাড়ে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা কত। সব তত্ত্বের বড় কথা হচ্ছে মুনাফা। পাহাড়ে অতিঅবশ্যই পর্যটন একটি লাভজনক খাত। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় মুনাফাই শেষ কথা। মুনাফার জন্য আদিবাসীদের উচ্ছেদ, আদিবাসীদের পণ্যায়ন হলে আদিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেলে রাষ্ট্রের কিচ্ছু যাবে আসবে না। তাহলে আমাদের কী করণীয়?

পর্যটনের নামে আমাদের পণ্য করা রুখতে হবে। (To resist commoditization and marketizaton of Indigenous people, culture and place)

চ্যানেল আইসহ মিডিয়ার ব্যাপারী যারা আমাদের সংস্কৃতি বাজারজাত করার হীন চেষ্টা করে তাদের প্রতিহত করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সচেতন হন, মানুষকে সচেতন করেন এবং তাদের প্রতিহত করতে রাস্তায় নামেন তাহলে মিডিয়ায় আমাদের পণ্য হিসাবে প্রদর্শনী করা বন্ধ করা যায়।

সব রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন মিলে যার যার অবস্থান থেকে ট্যুরিজমের নামে আমাদের পণ্য করা রুখতে হবে।

আমরা যারা রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত নই তারাও কিন্তু রাজনীতি করি। শাসকের রাজনীতি বা শাসকের শাসননীতির বিরুদ্ধে রাজনীতি। প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকা মানে শাসকের নীতিকেই মেনে নেওয়া। যদি তার বিরুদ্ধে কেউ মত পোষণ করেন, আমি মনে করি তার শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। আর সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ করা, বিক্ষোভ করার একটা পথ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় শাসননীতি ও শোষণনীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা।

আমার এই লেখা কোন প্রেমের উপন্যাস নয়। সুতরাং আমি চাই না এই লেখা পড়ার পর আপনি আমার লেখার কথা ভুলে যান। আমি চাই আমার লেখা পড়ে মানুষ ভাববে এবং



ভাবাবে। আমার লেখা যদি আপনাকে ভাবাতে পারে এবং মানুষের মধ্যে একটা আলোচনা তুলতে পারে তাহলেই আমার লেখা সার্থক। তাই এই লেখাটি পড়ার পর আর সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিন।

তথ্যসূত্র :

http://www.planeta.com/planeta/99/1199globalizationrt.html
http://www.countercurrents.org/sasi230812.htm
http://www.coha.org/the-infamous-link-between-sex-trafficking-sex-tourism-and-sporting-events-%E2%80%93-what-lies-ahead-for-brazil/
http://www.gale.cengage.com/pdf/samples/sp741209.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/15478/1/Cultural_industries_and_cultural_policy_%28LSERO%29.pdf
http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/learningthethaisextrade/
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/BriefingNote1_GREY.pdf
http://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=tourism%2C%20sex%20tourism%20%20threatening%20indigenous%20peoples&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CF0QFjAJ&url= http%3A%2F%2Fwww.twnside.org.sg%2Ftitle2%2Fresurgence%2F207-208%2Fcover1.doc&ei=eqcpUeGDDMXTrQeFq4HIBg&usg=AFQjCNG7w3BrZE2fag5kG28WpDavCh0IEA&bvm=bv.42768644,d.bmk

# পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকাশনা : স্বাধীন প্রকাশনা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা

হেগা চাকমা

আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের হাতে-কলমে প্রকাশনার কথা যদি বলি তা দীর্ঘ বছরের নয় বরং দীর্ঘ দিনের বা মাসের একটি তকমা দিয়ে তাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি । তবে এই স্বল্প সময়ে আমরা বেশকিছু উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা পাই যা আমাদের উদ্দীপিত করে সামনের দিকে ধাবিত হবার। কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার সাহায্যে এই স্বল্প পরিসরে আমরা সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

**পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকাশনা পরিচিতি**

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে প্রথম প্রকাশনা "গৈরিকা" ১৯৩৬ সালে আত্মপ্রকাশ করে। ধারণা করা হয়, চাক্মা রানী বিনীতা রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা রাজবাড়ি কেন্দ্রিক এই প্রকাশ-নাটির প্রচার সংখ্যা চৌদ্দ। ১৯৬৬ সালে তৎকালীন মহকুমা ও বর্তমান বান্দরবান পার্বত্য জেলা থেকে ত্রৈমাসিক "ঝরনা" অত্মপ্রকাশ করে। এরপর ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিরাজ মোহন দেওয়ানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম মাসিক পত্রিকা "পার্বত্য বাণী"। এই মাসিক পত্রিকাটি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। এছাড়া, স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে বেশ কয়েকটি স্বল্পায়ু সাময়িকী চোখে পড়ে। ১৯৪০ সালে "প্রগতি", ১৯৪৭ সালে "রাঙ্গামাটি নিউজ" ও ১৯৬২ সালে "রাঙ্গামাটি" তাদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঠিক কয়টি প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান জানা না গেলেও বিভিন্ন সূত্র মারফত যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তার উপর দাঁড়িয়ে এটা বলা বোধ হয় ভুল হবে না যে বিংশ শতাব্দীতে চাক্মা রাজবাড়ি থেকে প্রকাশনার ধারাটি আজ সর্বসাধারণের হাত ধরে ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় আমরা যেমন শোষিত জনগণের মতকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মোটাতাজা প্রকাশনাগুলির উত্থান দেখি, তেমনি শোষিত মানুষের কথা বলা বিকল্প প্রকাশনার আবির্ভাবকেও পাশ কাটিয়ে যেতে পারি না। তাই পাহাড়ের মিডিয়াকে জানতে হলে এর স্বরূপ জানা অত্যন্ত জরুরি। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় পাহাড়ের প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা "বনভূমি"। এছাড়া, বিভিন্ন প্রকাশনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- ১৯৮০ সালে প্রকাশিত "সমতা", ১৯৮১ সালে রামগড় থেকে প্রকাশিত



"পার্বতী"। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে ১৯৮১, ১৯৮২ সালে তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পর ১৯৮৩ সাল থেকে নিয়মিত দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে "গিরিদর্পণ"।

এছাড়া, বর্তমানে রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে দৈনিক রাঙামাটি, দৈনিক পার্বত্য বার্তা, গিরিপথ উল্লেখযোগ্য। বান্দরবান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে দৈনিক মৈত্রী, দৈনিক যুগরবি, পাকি সাংগু ও নতুন বাংলাদেশ নামক বেশ কয়েকটি পত্রিকা। খাগড়াছড়ি জেলার উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে "দৈনিক অরণ্য বার্তা", "প্রতিদিন খাগড়াছড়ি" ও "সাপ্তাহিক পার্বতী" অন্যতম। এই সংবাদ মাধ্যমগুলো জেলাবাসীকে দৈনন্দিন ঘটনাবলী সম্পর্কে তথ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ এলাকার যে একটা নিজস্ব লোকজ্ঞান আছে তার সংরক্ষণ, সাহিত্য গবেষণা ও উন্নয়ন, স্থানীয় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাহিত্যের প্রকাশ, বিকাশ ও প্রচার ফুটে উঠছে মূলত কিছু জ্ঞানপিপাসু বিভিন্ন ছাত্র সমিতি ও সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহের মাধ্যমে। এরাই অত্র এলাকার স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও শোষিত মানুষের কথা তুলে ধরেছে।

পাহাড়ের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর (জুভাপ্রদ) অসামান্য ভূমিকা রেখেছে। এই দপ্তর বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংকলন রচনা করে জুমিয়া ভাষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করছে। প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনাগুলোর মধ্যে বিজু (১৯৭২), জুনি (১৯৭২), বিঝুগুলো (১৯৭৬), ছদক (১৯৭৬), থেঝেরা (১৯৭৬) অন্যতম।

জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক) জন্মলগ্ন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকশিত করার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছে। ৮১ সালে আবির্ভাবের পর নব্বই দশকে "জাক" যে সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন তৈরি করতে পেরেছিল, তার মধ্য দিয়েই বর্তমান প্রজন্ম পাহাড়কে ভিন্নভাবে দেখতে শুরু করে। বর্তমান প্রজন্মের একঝাঁক সৃষ্টিশীল সাহিত্য কর্মী তৈরিতে "জাক" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জাক-এর প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল সমাজের একসময়ের চিন্তাশীল অনেক ব্যক্তিত্ব। ইরুক (১৯৮২), সত্রং (১৯৮২), হিয়াংসিক (১৯৮৩), সঙেত (১৯৮৪), কজ'ফুল (১৯৮৭), গঙার (১৯৯২), জ্বলি যার বুবর বুক (১৯৯৫), তানজাং (১৯৯৬), রাকা (সেতু, ১৯৯৮), লান (১৯৯৯), লামাপ্রা (২০০০), শিঙোর (২০০১), লেবা (২০০২), মা ত্রি চা লু মু খি পা খু ব ত (২০০২), মোন মুরো কানি যার (২০০৩), আমাং (২০০৩), লাঙ (২০০৪), কাওয়াং (২০০৪), হিল ভয়েস (২০০৫), টঙ (২০০৬), ত্যেঠা (২০০৮), সুলাই-প (২০০৯) ইত্যাদি জাক-এর প্রকাশনা। জাক এখনো তার কর্মকাণ্ড দ্বারা সৌন্দর্য পিপাসু মানুষের মনে সাহিত্য-শিল্প সুধা বিলিয়ে যাচ্ছে।

মুরুল্যা লিটারেচার গ্রুপ পার্বত্য চট্টগ্রামে সাহিত্য চর্চা, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক জ্ঞান আহরণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রাধামন-ধনপুদী, ক'জলি ( ১৯৭৮), বিঝু (১৯৮১), মুরুল্যা লিটারেচার গ্রুপের প্রকাশনা। এই প্রকাশনাগুলো পরবর্তী সময়ে সাহিত্য গবেষকদের জন্য বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়।

ঢাকা ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বিঝু সংকলন হিসেবে বেশ কয়েকটি প্রকাশনা প্রকাশ করে। ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগুলোর মধ্যে RAY (১৩৯১ বাংলা), Existence (১৩৯২ বাংলা) SURVIVAL (১৩৯২ বাংলা) অন্যতম।

জুম লিটারেচার ইয়ং সোসাইটি বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু প্রকাশনা প্রকাশ করে যেগুলো ইতোমধ্যে জুম্ম সাহিত্যধারায় নিজেদের অবস্থান পোক্ত করে নিয়েছে। এই সংগঠনের প্রকাশনা হিল (১৯৯৯), ইজোর (১৯৯৯), বিঝু ও ১০ই নভেম্বর সংখ্যাগুলো সেই সময়ে বেশ আলোচিত হয়। এছাড়া, বর্তমানে এই সোসাইটির অপর আরেকটি প্রকাশনা "জুম" বর্তমান সময়ে অন্যতম একটি ম্যাগাজিন বা আদিবাসী পত্রিকা হিসেবে আলোচিত। এই ম্যাগাজিনটি ২০০৩ সালে আবির্ভূত হওয়ার পর এখনো স্বগৌরবে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। জুম-এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে, এটি বর্তমানে আদিবাসী দিবস, ১০ই নভেম্বর স্মরণে, বিঝু-সাংগ্রাই-বৈসুক সংকলন, ভাষা দিবস সংকলনসহ বিভিন্ন উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে।

বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি বর্তমান সময়ের সাংস্কৃতিক চেতনায় পরিবর্তন ঘটানোর গুরুদায়িত্ব পালনকারী অন্যতম সংগঠন হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। এটি রাঙ্গামাটি জেলার জুরাইছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া গ্রামকেন্দ্রিক কিশোর-কিশোরীদের সমিতি হলেও অল্প সময়ে এটি সারা দেশে নিজের পরিচয়-কর্মকাণ্ড তুলে ধরে তৃণমূল পর্যায়ে সমাজকে বদলে দেওয়ার মডেল হয়েছে। এই সমিতি কর্তৃক ২০০১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ত্রিশের অধিক সংকলন বিভিন্ন উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে রানজুনি, আদিবাসী, রেং, স্মরণিকা, লাড়েই, বনযোগীছড়া, হেল মোনর গিরিত্তি, অথংবারে, জুনিপুক, আহ্বা, ছাবা, মুখখাত, তোকজিং, জাংফা, খুজুং ইত্যাদি অন্যতম। এই সমিতি আদিবাসী সংস্কৃতিকে মানুষের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি বনযোগীছড়াতে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছে, যা পাহাড়ের বর্তমান সমাজ উন্নয়ের জন্য একটি দূরদর্শী পদক্ষেপ। নিজস্ব ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক গ্রুপের মাধ্যমে সমিতির কর্মীরা নীরবে আদিবাসী সংস্কৃতি বান্ধব কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

বান্দরবান জেলার বালাঘাটা থেকে প্রকাশিত পাহাড়ের অন্যতম ছোটকাগজ "সমুজ্জ্বল সুবাতাস"। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই কাগজটির ১৯ তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পাহাড়ের সমতলি ও পাহাড়ি সংস্কৃতি চর্চার এই উর্বরক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথা প্রচারিত হচ্ছে। ১৯তম সংখ্যায় এই পত্রিকাটির স্লোগান ছিল "বাংলাদেশে প্রচলিত সকল আদিবাসী ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই"। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি বর্তমানে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। জানা যায়, এটি কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত।

পার্বত্য মানুষের কথা ছড়িয়ে দিতে "হিলি ওয়েবস" নামক একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। পত্রিকাটি ১৯৯৫ সালের দিকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। এছাড়া, উপজাতীয় সামাজিক ফোরাম থেকে প্রকাশিত বিঝু সংখ্যার নাম সাঙ্ক (২০০৪)। "মোনকধা" মোনঘর পরিবার কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিনের নাম। রাঙ্গামাটি থেকে হিল



উইমেনস ফেডারেশনের কর্তৃক ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয় "উত্তরণ" নামের সংকলনটি। এছাড়া, রাঙ্গামাটির ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনি থেকে প্রকাশিত প্রকাশিকা (১৯৯৩) সেই সময়ে নিজস্ব সংস্কৃতি তুলে ধরে বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল।

মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল ২০০৪ সাল থেকে নিজস্ব প্রকাশনা প্রকাশ করছে। ২০১০ সালে এ সংগঠন থেকে প্রকাশিত হয় "মো লাং নীং" নামক ম্যাগাজিনটি, এটি মারমা জাতিগোষ্ঠীর স্বকীয় সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করে সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে। ত্রিপুরা কল্যাণ ফাউন্ডেশন নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে বিশেষ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। এ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সংকলনগুলোর মধ্যে লাম্প্রা (১৯৯৬), ইয়াপ্রি (১৯৯৯) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফাউন্ডেশন (টিএসএফ) থেকে গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশিত হচ্ছে। "বৈসু" টিএসএফ কর্তৃক সংকলিত এমনই একটি প্রকাশনা।

"পহ্র জাঙাল" চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক তন্চংগ্যা শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক একটি প্রকাশনা। পাহাড়ের প্রধান উৎসব বিঝুকে কেন্দ্র করে ২০০২ থেকে প্রতিবছর এই প্রকাশনাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে। ঢাকাস্থ তন্চংগ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা সম্পাদিত আরেকটি ছোট কাগজের নাম "তৈনগাঙ"। এই কাগজটি ২০০৫ থেকে বিঝু অথবা আদিবাসী দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সম্পাদিত সাময়িকীর নাম "রঁদেভু"। এছাড়াও এখান থেকে "সাহিত্য সাময়িকী" নামক একটি মাসিক পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। সিলেট থেকে হিলট্যাক্ট স্টুডেন্ট ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিনের নাম "পাজোন্"। পাজোন্-এর বৈসাবি সংখ্যা ২০১০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জুম্ম ছাত্র কল্যাণ সমিতি থেকে প্রকাশিত আদিবাসী বিষয়ক সাহিত্য ম্যাগাজিন "হাজলং" প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ২০১১ সালের ৯ আগস্ট। পরের বছর একই তারিখে এই সমিতির দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়।

যে কয়টি জাতিতাত্ত্বিক পত্রিকা নিজস্ব মাতৃভাষা চর্চার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ও জনপ্রিয় হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল "চাঙমা সাহিত্য পত্রিকা"। ২০০১ সালে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করেই চাক্মা জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি ভালবাসা জাগাতে সক্ষম হয়। চাক্মা ও বাংলা অক্ষরে লেখা চাক্মা ভাষার ছোট গল্প, কবিতা, স্মৃতিকথা, প্রবাদ বাক্য, ধাঁধাঁসহ সকল সাহিত্য উপাদানকে একসূত্রে গেঁথে এটি হয়ে উঠেছিল চাক্মাদের সাহিত্যের অন্যতম প্রতিনিধি। "চাঙমা সাহিত্য পত্রিকা" মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরে অনিয়মিত হয়ে যায়। বর্তমানে যোগ্য কর্মীর অভাবে 'চাঙমা সাহিত্য পত্রিকা' হারিয়ে যেতে বসেছে।

তিন পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশের মাধ্যমে তাদের গবেষণা পত্রগুলো প্রকাশ ও প্রচার করছে। রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট থেকে প্রকশিত গিরিনির্ঝর (১৯৮৭), উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা (১৯৯৫) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বান্দরবান থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাগুলোর মধ্যে

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (বান্দরবান) থেকে প্রকাশিত পইংজ্রা, বোমাং রাজপুণ্যাহ স্মরণিকা প্রভৃতি অন্যতম।

এসব প্রকাশনার পাশাপাশি আরো বেশ কিছু প্রকাশনা পার্বত্য সাহিত্য ও প্রকাশনা জগতে বেশ আলোচিত-সমালোচিত। এদেরকে মূল্যায়নের জন্য আলাদাভাবে বেছে নেওয়ার কারণ, এই সব ম্যাগাজিন বা কাগজ মানুষের চিন্তাকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছিল। সাহিত্য শুধু গতানুগতিকতার জালে আবদ্ধ থাকবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাই, পাহাড়ের বর্তমান সময়ের অসাড়তা ভাঙাতে এমন প্রকাশনা প্রয়োজন, যেগুলো পার্বত্যবাসীকে বিশেষ করে শোষিত জুম্ম নৃতাত্ত্বিক জাতিগুলোকে নতুন সূর্যের আলো দেখাতে সক্ষম হবে। এই ধরনের চিন্তা থেকেই পূর্ববর্তী প্রতিবাদী সাহিত্য কেন বিকশিত হতে পারেনি বা পারছে না, তা অনুসন্ধান জরুরি মনে করে আমার এই লেখার অবতারণা। এখানে আমরা দেখার চেষ্টা করব, আমাদের সমাজে প্রতিবাদী সাহিত্যগুলোর উপযোগিতা এবং কেনই বা এরা টিকে থাকতে পারে নি।

**স্বাধীন প্রকাশনা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা**

প্রকাশনা প্রকাশ করতে আপনারা কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন- এই প্রশ্নটি রেখেছিলাম একজন লেখক বন্ধুর কাছে। তিনি জবাব দিলেন, সমস্যা অনেক। তারপর, একে একে সমস্যাগুলোর জট খুলে বলতে লাগলেন- টাকা পয়সার সমস্যা একটা বড় সমস্যা, জেলা পরিষদ টাকা দেবে দেবে করে মাসের পর মাস ঘুরিয়ে বছর পার করে দেয়, তবুও টাকা মেলে না। ফান্ড নিয়ে তালবাহানা করে এমন অনেক প্রতিষ্ঠানের কথা বলল বন্ধুটি। বন্ধুটির কথার মাঝে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর না পেলেও বর্তমান কালের অধিকাংশ প্রকাশনা কর্মীদের সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাটি অর্জন করলাম। বুঝলাম, সমস্যাটা আমাদের চেতনায়। গতানুগতিক কাব্য, গল্প ও দু-একজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের লেখার বাইরে পাহাড়ে খুব কমই রাগী-তেজী প্রকাশনা চোখে পড়ে। সাহিত্যকর্ম, রাজনীতি, সমাজ নিয়ে দোকানে দোকানে চায়ের কাপে ক্ষোভ, অথচ এ নিয়ে সাহিত্যে তেমন কোন ধারালো সমালোচনা সৃষ্টি হচ্ছে না, নেই বাস্তবতা থেকে উত্তরণের কোন দিকনির্দেশনা। এর বদলে আমরা যেসব প্রকাশনা দেখতে পাই তাদেরকে শিকড়হীন শেওলাদের ঢেউয়ের তরঙ্গে ভেসে বেড়ানো বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। পাহাড়ে দীর্ঘ জলপাই শাসন ও চুক্তিত্তোর দেড়যুগ ধরে চলতে থাকা ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের ফলে সৃষ্ট আড়ষ্ট সমাজের এই অচলাবস্থা ভাঙার দায়িত্ব পালনে সক্ষম, এমন প্রকাশনা পাহাড়ে খুব কমই দেখা গেছে। দু'একটি সাহসী প্রচেষ্টা যে ছিল না তা নয়, তবে সেগুলো বালির বাঁধের মত দানবীয় ক্ষমতার দাপটে ভেসে গেছে কিংবা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সমূলে। প্রকৃত অর্থে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায়, সেনা শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ঠ পাহাড়ি জনগণের কাছে সেই বাক স্বাধীনতা কোনকালেই ছিল না বা এখনো নেই। এর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রচার মাধ্যম বা প্রকাশনাকে ঘিরে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর রশি টানাটানি, লেখকগোষ্ঠীকে হুমকি প্রদান ও সর্বত্র দলীয়করণ, অসুস্থ রাজনীতির ছোবল। যার ফলে এখন



পর্যন্ত ফলপ্রসু রাজনৈতিক সমালোচনামূলক সাহিত্যধারা বিকশিত হতে পারে নি। একইভাবে প্রতিষ্ঠিত লেখক-কবি-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মগুলোর সমালোচনাও গলার কাঁটার মত আটকে আছে। ফলে প্রকৃত সত্য প্রকাশ ও নতুনত্ব অনুসন্ধান উপেক্ষিত থেকে গেছে। বিভিন্ন সময়ে আলোচিত কয়েকটি গণমাধ্যমকে তুলে ধরে বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করছি, যেগুলো শাসকদের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে তেজী লেখার মধ্য দিয়ে জনগণের হৃদয় স্পর্শ করেছিল, ভবিষ্যতমুখী চিন্তা-চেতনা ও সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় সংকেত জনমনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল অথবা সমাজের গতি-প্রবাহকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এসব প্রকাশনার কার্যক্রম বিভিন্ন সময়ে শাসকগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কোপানলে পরে স্তিমিত হয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে প্রকাশনাটি আত্মপ্রকাশ করেই পাহাড়ী ছাত্র-জনতার মুখপত্র হিসেবে বুক উঁচিয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল, সেটি ইতিহাসে "রাডার" নামে পরিচিত। "রাডার" প্রকাশনাটি "হিল লিটারেচার ফোরাম"-এর অনিয়মিত মুখপাত্র। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে "রাডার"-এর প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯৯২ সালের জুন মাস পর্যন্ত এর প্রকাশিত সংখ্যা ৫টি। "রাডার" প্রথম সংখ্যা ছাপা হওয়ার পর তৎকালীন স্বৈরাচারী সামরিক সরকার এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে রাডারের আরো চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রকাশনাটি শোষিত জুম্ম জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠ হয়ে উঠায় শাসকগোষ্ঠী আবারো রাডারকে নিষিদ্ধ খড়্গ আরোপ করে কণ্ঠরোধ করে। শাসকগোষ্ঠীর বাধার মুখে "রাডার" পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হতে না পারায় এটি ভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করে বলে জানা যায়। ১৯৯২ সালের ৬ অক্টোবর প্রকাশিত "সেটেলাইট" ম্যাগাজিনটি রাডারেরই অন্যরূপ বলে দাবী করা হয়েছে। এটিও প্রথম প্রকাশের পরপরই তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার (বিএনপি আমলে) কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। রাডারের কর্মী বাহিনীর অদম্য ইচ্ছায় কিছুদিন পর অপর একটি সংখ্যা "জুম্মকণ্ঠ" নামে প্রকাশিত হয়। "জুম্মকণ্ঠ" প্রথম প্রকাশের পরপরই নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তী সময়ে রাডার গ্রুপ পাহাড়ি গণপরিষদে যোগদান করে এবং "স্বাধিকার" নামক বুলেটিন প্রকাশ করতে থাকে, এটি চুক্তিত্তোর সময়ে ইউপিডিএফ-এর মুখপত্র হয়ে উঠে। জানা যায়, বর্তমানে 'স্বাধিকার' প্রচারপত্রটি বন্ধ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের গণমানুষের মুখপত্র হিসেবে "জুম্ম সংবাদ বুলেটিন" অনিয়মিত ইস্যুভিত্তিক সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হত। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এই প্রকাশনাটিও শাসক কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৯৯০ থেকে এ প্রকাশনার মাধ্যমে পাহাড়ের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তথা জুম্ম জাতির উপর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হয়। এছাড়া, ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর জুম্ম জাতির অগ্রদূত এম এন লারমা ও অন্যান্য শহীদদের স্মরণে জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ১০ই নভেম্বর স্মরণে বিশেষ বুলেটিন প্রকাশিত হয়ে আসছে। জুম্ম সংবাদ বুলেটিনের বিভিন্ন সংখ্যাগুলো বর্তমানে জুম্ম জনগণের

উপর শাসকগোষ্ঠীর চালানো বর্বরতার সাক্ষি, যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগঠিত হওয়া শোষণ-নির্যাতন-গণহত্যার ইতিহাস পাঠের দলিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ একসময় যুগের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। এই সংগঠন বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার আদায় আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিকভাবে নিজস্ব সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে ছাত্র সমাজের চেতনা জাগিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। এর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে শাসকের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের কথা উচ্চারিত হয়ে সুশীল সমাজের কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল।

"মাওরুম" বর্তমান সময়ের একটি অন্যতম আদিবাসী বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা। এটি "হিল রিসার্চ এন্ড প্রোটেকশন ফোরাম" এর প্রকাশনা, যা ২০০৪ থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। চুক্তিত্তোর পার্বত্য চট্টগ্রামে লিটল ম্যাগাজিন, ছোট কাগজসহ বিভিন্ন প্রকাশনার উপর যে আক্রমণ ও বিধিনিষেধ, যা একই সাথে বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আক্রমন, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ ধারণকারী হিসেবে মাওরুমের আবির্ভাব চোখে পড়ার মত। "মাওরুম" বেশ কিছু সংখ্যায় চুক্তিত্তোর পার্বত্য রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের মুখোশ উন্মোচন করার মত তথ্য জনগণের সামনে উপস্থাপন করেছে, যেগুলো সমকালীন সমাজে বেশ আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এক্ষেত্রে, মাওরুম ৩য় সংখ্যায় ইউপিডিএফ-এর দলত্যাগী লেখক দীপায়ন খীসার "বন্ধু হতে চেয়ে... শত্রু বলে গণ্য হলাম" প্রবন্ধটিসহ বেশ কিছু লেখা আলোচনার দাবী রাখে। এই লেখায় দীপায়নবাবু "মাওরুম" পরিবারের উপর একটি রাজনৈতিক দলের আক্রোশ ও আক্রমণ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। "মাওরুম" পরিবারের সদস্য ও "ফিরে দেখা সংগ্রাম"-এর লেখক নিকোলাস চাক্‌মাকে মাওরুমে লেখালেখি করার জন্য নোটিশ প্রদান ও সতর্কীকরণ, চট্টগ্রামস্থ মাওরুম প্রতিনিধি পলাশ চাক্‌মার বাড়িতে গিয়ে চেলাচামুণ্ডা দেখিয়ে ভয় প্রদর্শনসহ বিভিন্ন ইস্যু স্পর্শকাতর হিসেবে উঠে এসেছে। এই আক্রোশ যে কতটা ভয়ংকর তা দীপায়নের লেখার একটি লাইন পড়লেই বুঝা যায়- "মাওরুম প্রকাশনার সাথে জড়িতদের একটা লিস্টও তৈরি হয়েছে বলে উজ্জ্বলবাবু তার বন্ধুকে জানালেন"। উপর্যুক্ত বিষয়টি উল্লিখিত সংখ্যার সম্পাদকীয় অংশেও প্রতিফলিত হয়। একইভাবে, মাওরুমের ১৫তম সংখ্যায় দীপায়ন খীসার অপর একটি লেখায় উপর্যুক্ত অভিযোগকে আরো জোড়ালোভাবে উপস্থাপন করা হয়- "ভিন্ন মতাবলম্বীরা মাওরুম নামের একটি কাগজ বের করলে ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম থেকে পত্রিকাটি ছিনতাই করে। মাওরুম পত্রিকার সাথে জড়িত থাকা ও লেখার অপরাধে তারা নিকোলাস ও জ্যোতিলাল চাকমাকে অপহরণের প্রচেষ্টা চালায়। চলতি রচনার লেখককে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে"।

পাহাড়ে আরেকটি আশা জাগানো ম্যাগাজিনের নাম "উন্মেষ"। "উন্মেষ" ম্যাগাজিনটি ২০০৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যে কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত



হওয়ার পর হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ লিটল ম্যাগাজিন থেকেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, "চাক্‌মা উপন্যাস চাই"; তেমনি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, "চেতনার নিশান কারা বহন করবে?"।

একঝাঁক উদ্যমী তরুণ-ছাত্র কর্মী সৃষ্টিশীল ও পরিবর্তনকামী মানসিক শক্তি দ্বারা বলীয়ান হয়ে "উন্মেষ" নামক ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করেছিল, যা অল্প সময়ে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই প্রকাশনাটিকে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল ও এর স্টুডেন্ট উইং প্রতিপক্ষের এজেন্ট চিহ্নিত করে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ তুলে। এভাবে, প্রপাগাণ্ডা চালতে থাকলে "উন্মেষ" পরিবার একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠে এবং বাধার সম্মুখীন হয়; ফলে পাঠচক্রসহ বিভিন্ন মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা স্থবির হয়ে যায়। ২০০৬/০৭ সালের দিকে উন্মেষ পরিবার তাদের প্রকাশনাটি আবারো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে চাইলেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে তা হয়ে উঠে নি বলে জানা গেছে। উন্মেষ এখন আর প্রকাশিত হয় না।

রাজনৈতিক দল হিসেবে ইউপিডিএফ আত্মপ্রকাশের পরপরই "স্বাধিকার" নামক বুলেটিনটি দলটির মুখপত্র হয়ে উঠে। একসময় স্বাধিকার পত্রিকাটি হারিয়ে যায়। সম্প্রতিক সময়ে ইউপিডিএফ-এর "জাতীয় বার্তা" নামক পত্রিকাটি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় বলে জানা গেছে। "জাতীয় ডাক" পাহাড়ের স্বায়ত্তশাসনকামী রাজনৈতিক দল ইউপিডিএফ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত একটি সংবাদ বুলেটিন। ২০১২ সালে এই পত্রিকাটি বিতরণের সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিপক্ষ দলের কর্মী দ্বারা পত্রিকাটি ছিনতাই ও পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (ইউপিডিএফ) মানববন্ধন করে প্রতিবাদ জানিয়েছে বলে গণমাধ্যমের বরাতে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন সময়ে প্রতিপক্ষ দলের কর্মীরা অভিযোগ করেছে, এই পত্রিকা দ্বারা ইউপিডিএফ একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি জনগণের মনে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে।

এর বাইরেও রাজনৈতিক সমালোচনামূলক লেখালেখি করার কারণে বেশ কিছু লেখক বা কাগজকে সতর্ক করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন বলেছে, রাজনৈতিক সমালোচনা না করার জন্য সব দিক থেকে অদৃশ্য বিধিনিষেধ আরোপিত। তাই বর্তমানে অধিকাংশ কাগজের সম্পাদকেরা রাজনৈতিক লেখা ছাপাতে গিয়ে পিছু হটে আসেন। ফলে, পাঠককে গতানুগতিক অরাজনৈতিক সাহিত্য গেলানোই হয়ে উঠেছে বর্তমান ম্যাগাজিনগুলোর একমাত্র চর্চা। একারণে, সমাজের ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান যেমন- বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল, পার্বত্য জেলা পরিষদ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক পরিষদ, উন্নয়ন বোর্ড, প্রতিষ্ঠিত এনজিও, সেনা প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয় না বললেই চলে। এর আরেকটি অন্যতম কারণ, এ সকল প্রতিষ্ঠানই বর্তমান সময়ের প্রকাশনা-ম্যাগাজিন-কাগজগুলোর অন্যতম পৃষ্ঠপোষোক ও ফান্ড দানকারী গোষ্ঠী। তাই, সমাজের অন্যায়, দুর্নীতি ও আড়ষ্ট

চরিত্রকে ভাঙতে হলে প্রকাশনাগুলোকে অবশ্যই সাহসী হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যৌক্তিক প্রতিবাদধর্মী ও সমালোচনামূলক সাহিত্যধারার জন্ম দিতে হবে। সাহিত্যে এ ধারা তৈরির মধ্য দিয়েই সকল অন্যায়ের মুখোশ উন্মোচন করে প্রগতিশীল চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। এক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধাকে অতিক্রম করার জন্য যে আদর্শিক শক্তি ও ভিত্তি প্রয়োজন, তা পুনঃপুন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই অর্জন সম্ভব। কেননা, সাহিত্যই পারে বর্তমান অচলাবস্থাকে গণমানুষের কাছে তুলে ধরতে, সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখা নির্মাণের মহৎ দায়িত্বটি পালন করতে হবে সাহিত্যকেই। পাহাড়ের এই অসুস্থ বাস্তবতা থেকে ভবিষ্যতের সুন্দর স্বপ্ন বুনে দেওয়ার দায়িত্ব কবি-লেখকগোষ্ঠীগুলোর উপরই বর্তায়।

**একটি ছোট্ট পর্যবেক্ষণ থেকে সঠিক দিক অনুসন্ধান**

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিবাদী সাহিত্যধারায় গণমাধ্যমের সংকট ছিল, বর্তমানেও আছে। যে কয়েকটি প্রকাশনা, ছোট কাগজ প্রতিবাদী সাহিত্য জন্ম দানের মধ্য দিয়ে সমাজে ঘটে চলা অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে "রাডার", "জুম্ম সংবাদ বুলেটিন" ও "মাওরুম" পথিকৃত হিসেবে বিবেচিত হবে। যদিও, সময়ের সাথে সাথে এ গণমাধ্যমগুলোর মৌলিক চরিত্রের বদল ঘটেছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা উচিত। তবুও সময়ের সাহসী ভূমিকা পালনকারী হিসেবে এদের দৃষ্টান্তকে অস্বীকার করা যায় না। "রাডার" অবিভক্ত শোষিত-নিপীড়িত জুম্মজাতির কণ্ঠস্বর হিসেবে আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে যে চেতনা জাগিয়েছিল, তা অনেকের মনে গেঁথে যায়। "রাডার" অচিরেই স্বৈরাচার শাসক কর্তৃক ১৯৭৪ এর সংবিধানের বিশেষ ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে [রাডারের ২য় সংখ্যার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ ছিল ১৯৭৪ এর ১৭(১) সি।] তারপরও, রাডারের চেতনা বারবার ফিরে এসেছিল শোষিত-বঞ্চিত গণমানুষের মনে। আবার, সমাজ ও বাস্তবতার রাডার হিসেবে "মাওরুম" সবসময় তার দায়িত্ব পালন করেছে বলে ভাবা হলেও আসলেই কি "মাওরুম" নির্ভীকভাবে এ দায়িত্ব পালন করে গেছে? এই প্রকাশনাটি দীর্ঘ বিরতির পর প্রকাশিত হয়ে সংখ্যা-১৪ তে জানাচ্ছে, "এ বিরতির কোন ব্যাখ্যা নেই"। উল্লেখ্য, নভেম্বর ২০০৭ থেকে আগস্ট ২০০৮ পর্যন্ত মাওরুমের কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। এ সময়টি দেশে জরুরি অবস্থার সময়। এই সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে উঠে এসেছে জরুরি অবস্থা ও এর পরবর্তী পাহাড়ে খণ্ডিত বাস্তবতার কথা। জরুরি অবস্থার মধ্যে "মাওরুম" অপ্রকাশিত থাকাকে সম্পাদক "এ বিরতির কোন ব্যাখ্যা নেই" জানালেও এর ব্যাখ্যা পাঠককেই খুঁজতে হবে। স্বপক্ষত্যাগী দীপায়ন সহ দলত্যাগী মাওরুম কর্মীদের লেখায় উঠে আসা তথ্য নিঃসন্দেহে জনমনে ব্যাপক ভাবনা এনেছে, মানুষকে আরো কৌতূহলী করেছে। মাওরুম গোষ্ঠীর লেখায় উঠে আসা ইউপিডিএফ-এর অভ্যন্তরীণ দলীয় কাঠামো ও গণতন্ত্র বর্জিত প্রথা নিয়ে জনগণ যেমন সন্তুষ্ট নয়, তেমনি দীপায়ন যে পক্ষে যোগ দিয়ে ভাল মানুষ ভাবটি নিচ্ছেন, সে পার্টির গণতান্ত্রিক কাঠামো নিয়েও মানুষ কৌতূহলী। জেএসএস মূলধারাচ্যুত অনেক নেতার কণ্ঠ ও ইউপিডএফত্যাগী দীপায়নের কণ্ঠ প্রায় একই সুর। তাই দীপায়নের বোমা ফাটানো লেখনীকে সন্দেহবাদী দৃষ্টিতে দেখতেই হয়। প্রশ্ন জাগে,



একজন লেখক-সম্পাদক কি নিজেকে দলীয় বৃত্তাবদ্ধ রাখবেন, নাকি সমাজের সকল বিষয়কে একজন লেখকের মত ফুটিয়ে তুলবেন। তবুও মাওরুম সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য একারণে যে, অন্তত তারা মানুষের মনে এই সমালোচনা করার ভিত গড়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে, নতুনত্বের শ্লোগান উঁচিয়ে কালের অভাব ঘুচানোর যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উন্মেষ জন্ম নিয়েছিল, মানুষের মনে "চেতনার নিশান কারা বহন করবে?" এ প্রশ্নটি জাগিয়েও উন্মেষ, নিজেই সেই চেতনার ভার বহন করতে অক্ষম অথবা চেতনা বয়ে বেড়ানোর সেই শক্তিকে ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। "জাতীয় বার্তা" নিষিদ্ধ হওয়া একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রমুখোশ পরিহিত ফ্যাসিবাদী সরকারেরই চরিত্র প্রকাশ করে। "জাতীয় ডাক" পত্রিকাটি প্রতিপক্ষ দলের হাতে ছিনতাই ও অগ্নিসংযোগের শিকার হওয়াটা অবশ্যই আমাদের সমাজের জন্য নেতিবাচক, এই কর্মকাণ্ডে জড়িতরা অপরাধী, তবে একই সাথে এটা লক্ষ করতে হবে যে, এই পত্রিকা প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে ফায়দা লুটছে কিনা। নিপীড়িত জনতার মুখপত্র ট্যাগ লাগানো এ গণমাধ্যমটি পাঠ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, গণমাধ্যম চরিত্রের আড়ালে এটি একটি দলীয় প্রচারপত্র ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তারপরও এইসব দলীয় গণমাধ্যমের শক্তিশালী দিক হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় শোষণের বিরুদ্ধে উচ্চারিত কণ্ঠস্বর হয়ে এগুলো সর্বস্তরে প্রচারিত এবং সর্বাধিক জনগণের দুয়ারে যেতে সক্ষম।

সংবিধানের বিশেষ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বা সেনাশাসকদের শকুনী আচরণ যেমন প্রতিবাদী সাহিত্য চেতনায় আঘাত হেনেছে, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভক্ত জুম্ম রাজনীতি বারবার স্বাধীন মত প্রকাশ বা স্বাধীন চিন্তা বিকাশের পথে বাধা হয়ে এসেছে। সর্বত্র রাজনীতিকীকরণ মানসিকতার কারণে ভিন্নমতধারী ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর একচোখা কর্মীদের হাতে প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, ফলে স্বাধীন মত প্রকাশের মত কোন ক্ষেত্র গড়ে উঠেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর গিলে খাওয়া মানসিকতা সম্ভাবনাময় অনেক ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিকে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে, প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত স্বদেশের বুক দেখেও মানুষ জাগছে না। কয়েকটি সামাজিক সংগঠন গলা বন্ধক রেখে অন্যের কোলে বসে যে কয়েকটি পাতা উপহার দিচ্ছে, তা যেন রক্তাক্ত রোগীকে চিকিৎসার বদলে ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসির গান শোনানো। আবার এও দেখা যায়, কিছু দলকানা সম্পাদক ও লেখকগোষ্ঠী ক্ষমতাবান কোন দলের ছত্রছায়ায় গুরুভক্তির পাশাপাশি প্রতিপক্ষ দলের বুক কাঁপিয়ে সাহস দেখিয়ে বেড়ান! এখানেই আমাদের চেতনার কবর রচিত হয়। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি যে কাজটি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে এমন এক সাহিত্যধারার আবির্ভাব ঘটানো যা সমাজকে দেখার স্বচ্ছ দর্পণ হয়ে উঠবে। যে দর্পণে সকল সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে যৌক্তিক সমালোচনা ও প্রতিবাদ উচ্চারিত হবে, তথ্য ও জ্ঞানকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার মত শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরির মধ্য দিয়ে তা সর্বসাধারণের হাতে পৌঁছুতে সক্ষম হবে। এটা সমাজে এমন এক চিন্তার জন্ম দেবে যেখানে মানুষ অন্ধভাবে নয়, যুক্তিবাদী মন নিয়ে দেশ, জাতি, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিসহ দৈনন্দিন জীবনাচরণকে বিচার করবে।

আমরা এমন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যেমন অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাবো, বর্তমানকে দেখবো, তেমনি দূর ভবিষ্যতের দিকেও আমাদের প্রখর দৃষ্টি প্রসারিত করবো। বর্তমান বাস্তবতায় আমাদেরকে ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে যেমন শিক্ষা নিতে হবে, তেমনি আমরা যে পথে হাঁটব তার দিক নির্ণয় করতে হবে, স্পষ্টভাবে জানতে হবে কোথায় আমাদের সুনির্দিষ্ট গন্তব্য। এজন্য আমাদের দীর্ঘদিনের ঘুণে ধরা চেতনাকে জাগাতে হবে, আলো জ্বালতে হবে সেই চেতনার মশালে, নিজে আলোকিত হয়ে অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে দিতে হবে সেই আলো, এভাবেই জগতকে আলোকিত করার স্বপ্ন দেখতে হবে। তবেই জগত আলোকিত হবে। পরিশেষে, উন্মেষের লেখক মিলিন্দ কর্তৃক উত্থিত প্রশ্নটির সুরে বলতে চাই- চেতনার নিশান কারা বহন করবে?

তথ্যসূত্র :


১. http://www.dcrangamati.gov.bd/index.php?option=com_content&view= article&id=80&Itemid=90

২. http://radarcht.blogspot.com/2012/10/blog-post_140.html

৩. http://www.sangbad.com.bd/?view=details&type=gold&data= Tax&pub_no=1242&menu_id=16&news_type_id=1&val=115594

৪. http://radarcht.blogspot.com/2012/10/blog-post_140.html

৫. হিল রিসার্স এন্ড প্রোটেকশন ফোরাম, মাওরুম, পঞ্চম বর্ষ, সংখ্যা ১৪। পৃষ্ঠা ০৫।




# পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িকতার উৎসমুখ

এডিসন চাকমা

আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায়শই দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং তার ভিতরকার রূপ ছেড়ে বাইরে এসে সৃষ্টি করেছে মারামারি, খুনোখুনির মত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, যাকে সোজা কথায় আমরা দাঙ্গা বলে চিহ্নিত করে থাকি এবং এটি স্বাভাবিকভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানরত দুই জাতির জাতিগত দ্বন্দ্ব। একদিকে পাহাড়ি আর অন্যদিকে সরকার কর্তৃক পুনর্বাসিত বাঙালি। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই পাহাড়ি আর বাঙালি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি একদিনে হয়নি; পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি আর বাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টির ইতিহাস বেশি দীর্ঘ নয়, আবার একেবারে ইদানিংকালেরও নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি আর বাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টি, একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস, ঘৃণা সৃষ্টির ব্যাপারে বুঝতে হলে ইতিহাসের পাতায় কিছুটা চোখ বুলাতে হবে–

- আনুমানিক ৫৯০ সালে চাকমা যুবরাজ বিজয়গিরি ও সেনাপতি রাধামন খীসা কর্তৃক রোয়াং রাজ্য (বর্তমান রামু), অক্সাদেশ (আরাকান সীমান্ত), খারং দেশ, কাঞ্চন নগর (কাঞ্চন্দেশ) ও কালজয় (কুকি রাজ্য) প্রভৃতি রাজ্য বিজিত হলে বিশাল পার্বত্য রাজ্য চাকোমাস এর পত্তন ঘটে।
- চাকমা রাজা জনুর সময় রাজ্যসীমা ছিল পূর্বে নাম্রে (বর্তমান নাফ নদী), পশ্চিমে সীতাকুন্ড পাহাড়, দক্ষিণে সমুদ্র ও উত্তরে চাইচাল পর্বতশ্রেণী।
- ১৫৫০ সালে JOAO DE BARROS নামে জনৈক পর্তুগিজের আঁকা মানচিত্রে কর্ণফুলী নদীর পূর্বতীরে দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে চাকোমাস (CHACOMAS) নামে একটি রাজ্যের সন্ধান পান। এর অবস্থান শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ পূর্বে এবং আরাকানের উত্তরে অর্থাৎ বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পর্যন্ত।

উপর্যুক্ত ইতিহাস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তথা চাকমা জনগোষ্ঠী কোন ভিনদেশ থেকে এই বঙ্গে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। চাকমারা প্রথমে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে চাকোমাস রাজ্যের পত্তন ঘটায়। তারপর একে একে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকজন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মায়ানমার থেকে চাকোমাস রাজ্যে এসে বসবাস শুরু করে। ১৯০৮ সালে শ্রীসতিশচন্দ্র ঘোষ "চাকমা জাতি (জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত)" গ্রন্থে এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন। ইংরেজরা এদেশে আসার অনেক আগে "চাকমা রাজা আর বাঙালি রাজারা একসাথে আরাকানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত"। এই থেকে প্রমাণিত হয় তখন চাকমা রাজা আর বাঙালি রাজাদের মধ্যে বেশ ভাল একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

- ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করে ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলা বিজয়ের পর ইংরেজরা চোখ রাখল পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা চাকোমাস রাজ্যের দিকে। সে সময় বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস তুলা জন্মাত। এই কারণে এই রাজ্যের আরেক নাম ছিল "কার্পাস মহল"। পরে অবশ্য নামকরণ করা হয় CHITTAGONG HILL TRACTS.
- ১৭৭০ ও ১৭৮১ সালে চাকমা রাজা দৌলত খাঁর সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ ও চাকমা রাজার জয়লাভ।
- চাকমা রাজা জান বক্স খাঁর সাথে ইংরেজদের পর পর তিন বছর (১৭৮৩, ১৭৮৪, ১৭৮৫) যুদ্ধ। ১৭৮৭ সালে চাকমা রাজা জান বক্স খাঁর কলকাতায় বড়লাটের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা এবং বাৎসরিক ৫০০ মন কার্পাস তুলা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা। ইংরেজদের সাথে চাকমা রাজার শান্তি প্রতিষ্ঠার ফলে চাকমা রাজা বাৎসরিক ৫০০ মন তুলা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করল। অন্যদিকে নিজ রাজ্য শাসনের ক্ষমতা নিজের হাতেই থেকে গেল। ফলে ব্রিটিশ শাসিত এত বৃহৎ পাক-ভারত উপমহাদেশের মধ্যে ছোট্ট এক টুকরো পার্বত্য চট্টগ্রাম, চাকমা রাজার দ্বারা পরিচালিত স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হিসেবে থেকে গেল।
- ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন। সারা পাক-ভারত জুড়ে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা কার্যকরী হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম নির্ভর চাকমা রাজ্যে কার্যকর হল না। এর কারণ- (১) রাজতন্ত্র, (২) জুমিয়াদের এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে জুম চাষের উদ্বাস্তু জীবন।
- ১৯০০ সালে জারি হল CHT REGULATION, 1900 Act 1900 সালের ১ মে জারি হওয়া এই আইনের মাধ্যমে বাইরের কেউ যাতে পার্বত্যবাসীর সহজ-সরল জীবন যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে তার জন্য পার্বত্যবাসীদের জন্য এক প্রকার শাসনবিধি চালু করা হল।
- ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে জন্ম নিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম নিল পাকিস্তান আর ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের। চাকমা রাজার দ্বারা স্বায়ত্বশাসিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে পাকিস্তান অংশের সাথে যোগ করা হল। সেই থেকে শুরু হল পার্বত্যবাসীর ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আর বাঙালিদের অবাধ অনুপ্রবেশ। ১৯৪৭ সালের আগে যে সব বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করত তাদের সবাই বিভিন্ন ব্যবসার কাজে নয়তো চাকরির কারণে বসবাস করত।
- পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৪৮ সালে "পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন ১৮৮১" বাতিলকরণ।
- পাকিস্তান আর পাকিস্তান পূর্ব পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন আদমশুমারি :

  ১৯৪১ সাল- পাহাড়ি ৯৭.০৬% বাঙালি ০২.৯৪%

  ১৯৫১ সাল- পাহাড়ি ৯৩.৭১% বাঙালি ০৬.২৯%

  ১৯৬১ সাল- পাহাড়ি ৮৮.২৩% বাঙালি ১১.৭৭%



পার্বত্য চট্টগ্রামে এভাবে দ্রুত বাড়তে লাগল বাঙালি জনসংখ্যা। তবুও তখনো পাহাড়ি-বাঙালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা মারামারির মত ঘটনা ঘটেনি। কারণ সে সময় যে সব বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসের জন্য গিয়েছিল তাদের সবাই নিয়মতান্ত্রিকভাবেই গিয়েছিল আর এরা কেউ পাহাড়িদের জমি কেড়ে নিয়ে বসবাস শুরু করেনি, ফলে মারামারিও হয়নি।

- ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে ৯৯ হাজার ৯শ ৭৭ জন লোক জমিহারা ও বাস্তুহারা হয়ে পড়ে। এতে মোট চাষযোগ্য জমির ৫৪.০৬% অর্থাৎ ৫৪ হাজার একর আবাদি জমি প্লাবিত হয়।
- ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকারের পুনর্বাসনে অবহেলা ও অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৫০ হাজার নর-নারী উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আর ৩০ হাজার নর-নারী উদ্বাস্তু হয়ে বার্মায় গমন করে। এর ফলে পার্বত্য এলাকার মধ্যে পরিবেশগত ভারসাম্যের বিরাট একটা পরিবর্তন হল। সাথে সাথে পাহাড়ি-বাঙালি জনসংখ্যার মধ্যেও বিরাট একটা পরিবর্তন হল। এম. এন. লারমা চট্টগ্রাম কলেজে পড়ার সময় বাম রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি পার্বত্য এলাকার জনগণকে জানিয়েছিলেন যে কাপ্তাই বাঁধের সুফল পাহাড়িদের জন্য নয়, এটি পাকিস্তান সরকারের একটি ষড়যন্ত্র। ফলে ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার হন এবং ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ শর্তসাপেক্ষে মুক্তি পান। এম. এন. লারমার নেতৃত্বে তৎকালীন সচেতন পাহাড়ি জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইলে তদানীন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ প্রধান সাইদুর রহমান তার পাহাড়ি-বিরোধী মনোভাবের কারণে তাদেরকে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দেন।
- ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে জন্ম হল স্বাধীন বাংলাদেশের।
- ১৯৭২ সালে রচিত হল স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান যার চারটি মূলনীতি হল জাতীয়তা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত হল "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন"।

তদানীন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম. এন. লারমা) এর প্রতিবাদে সংসদে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি একজন চাকমা। আমার বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ কেউ বলে নাই আমি বাঙালি। একজন চাকমা কখনো বাঙালি হতে পারে না। তেমনি একজন বাঙালি কখনো চাকমা হতে পারে না। এই সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী চাকমা, মারমা, ট্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরুং, চাক এদের কথা বলা হয় নি। এই মানুষদের কথা আমি বলতে চাই। পৃথিবীর একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত, আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র, সেখানে আমরা দেখি তাদের সংবিধানে বিভিন্ন জাতিকে অধিকার দেওয়া হয়েছে। জানি না,

আমরা কি আপরাধ করেছি! আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশি বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালি বলে নয়, এরপর এম. এন. লারমা প্রতিবাদ স্বরূপ সংসদ কক্ষ ত্যাগ করলেন।

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ৪ দফা দাবী সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীনামা পেশ করা হলে শেখ মুজিব এম. এন. লারমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "লারমা তুমি যদি বেশি বাড়াবাড়ি কর তাহলে এক লাখ, দুই লাখ, তিন লাখ, দশ লাখ বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকিয়ে দেব। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমি তোমাদের সংখ্যালঘু করে ছাড়ব"। এর পর থেকে শুরু হল আন্দোলন, সংগ্রাম।

- ১৯৭২ সালে বিভিন্ন গণদাবী ও ছাত্রদাবীর প্রেক্ষিতে রাঙ্গামাটির দেয়ালে দেয়ালে লিফলেট ও পোস্টার শোভা পায় এবং ৯ জুন জেলা প্রশাসকের কাছে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির স্মারকলিপি পেশ।
- ১৯৭৩ সালে রাঙ্গামাটির স্টেডিয়ামে এক নির্বাচনী জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পাহাড়িদেরকে বাঙালিতে পরিণত করার ঘোষণা।
- পাহাড়িদের উপর নির্যাতন, জুলুম ও ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি গঠিত হয় "শান্তিবাহিনী" বা "PEACE FORCE"। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত চলল রাজপথে আন্দোলন, সংগ্রাম। দীর্ঘ এই চার বছরে কোন ফল পাওয়া গেল না, উল্টো বেড়ে চলল নির্যাতন, জুলুম। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানি এম. এন. লারমাকে অস্ত্র ধরার পরামর্শ দিলেন। এরপর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে ১৯৭৬ সাল থেকে শুরু হয় শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম।
- ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিলাইছড়ি আর্মড পুলিশ ক্যাম্প এবং খাগড়াছড়ির বেতছড়িতে পুলিশের নৌকায় সফল হামলার মধ্য দিয়ে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র কার্যকলাপের সূচনা।
- ১৯৭৯ সালে ৩০ হাজার বাঙালি পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এর জন্য ৬৫ কোটি টাকাও বরাদ্দ করা হয়। এই ৩০ হাজার বাঙালি পরিবারকে পুনর্বাসনের পর থেকেই মূলত পাহাড়ি-বাঙালি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার পথচলা শুরু। অনেকেই মনে করেন বাংলাদেশের ১০ ভাগের এক ভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশাল এলাকা। এখানে জায়গা-জমির কোন অভাব নেই, অনেক জমি পতিত রয়েছে। জমি আছে, কিন্তু চাষ করে খাওয়ার মানুষের অভাব। যারা এই ধরনের ভ্রান্তধারণা নিয়ে চলেন তারা আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস কিছুই জানেন না, তাই এই ধরনের চিন্তা ধারণ করেন। যেখানে জমির অভাবে ১৯৬০ সালের কাপ্তাই বাঁধের ফলে ৮০ হাজার মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও বার্মায় চলে যেতে বাধ্য হয় সেখানে জমি কোথায়? তার উপর বনবিভাগের সংরক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই বাঁধের নিচে তলিয়ে যাওয়া ৫৪ হাজার একর চাষযোগ্য জমি, সরকারি



অফিস-স্থাপনা, আর্মি-পুলিশ-বিজিবির জন্য বিশাল বিশাল সংরক্ষিত এলাকা- তাহলে জমি কোথায়? বিশেষ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি বিশাল অংশ (বাংলাদেশের মোট সেনাবাহিনীর ৩ ভাগের ১ ভাগ) রয়েছে, তাদের ক্যাম্পের জন্য দখল করে রেখেছে একটি বিশাল পরিমাণ জমির অংশ। তাহলে জমি কোথায়? এত বড় সংখ্যক বাঙালি পুনর্বাসন করবে কোথায়? তাহলে উপায়? হ্যাঁ জমি আছে, উপায় আছে। পাহাড়িরা যে জমিতে বসবাস করছে সেই জমি। পাহাড়িরা ১৯৪৭ সালের আগে পাকিস্তান বা বাংলাদেশ অংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না ফলে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যকরী না হওয়ায় আর পাকিস্তান বা বাংলাদেশ সরকার এই ব্যাপারে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে সচেতন না করায় কেউই জমি-জমার দলিলপত্র বা বন্দোবস্ত প্রথার দিকে হাঁটল না। তাছাড়া পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ অশিক্ষিত হওয়ায় এবং রাজতন্ত্রের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব ভুমি ব্যবস্থা চালু থাকায় যে জমিতে পাহাড়িরা বসবাস করছে সেই জমি সরকারের কাছে খাস জমি। যেই জমিটি পাহাড়িরা চৌদ্দ পুরুষ ধরে ভোগ করে আসছে, রাজাকে খাজনা দিয়ে যাচ্ছে সেই জমিটি এক চুটকিতে কোন এক বাঙালির হয়ে গেল। সামরিক সরকার সেই জমির দলিলপত্র বাঙালি পরিবারটির নামে করে দিল, যেই জমিতে চৌদ্দ পুরুষ ধরে বসবাস করছে কোন পাহাড়ি পরিবার। সামরিক সরকার "মানুষ নয়, জমি চাই" নীতি অনুসরণ করল। তাছাড়া অধিকাংশ বাঙালিদের মধ্যে উগ্র জাতিয়তাবাদী চেতনা বিদ্যমান থাকায় পাহাড়িদেরকে এরা সাপ-ব্যাঙ খাওয়া নিচু জাত বলে মনে করত এবং নাক সিটকিয়ে এড়িয়ে চলত। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসের প্রথম গণহত্যা সংগঠিত হয় ১৯৮০ সালে।

- পার্বত্য ইতিহাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আর সেটেলার দ্বারা সর্ব প্রথম গণহত্যা হয়েছিলো কাউখালী বাজার কলমপতিতে (রাঙামাটি) ২৫/৩/১৯৮০ সালে। পাহাড়ি ভাই-বোনদের মিটিং এর মধ্যে ডেকে গুলি করা হয়েছিলো। হত্যা করা হয়েছিল ৩০০ জনকে এবং ১০০০ এর বেশি পাহাড়ি মানুষ রিফিউজি হিসেবে ভারতের ত্রিপুরায় পালিয়ে যায়। ঐ জায়গাগুলো আজ বাঙালিদের দখলে। পরিকল্পনাকারী সেনা কর্মকর্তারা প্রমোশন পেয়েছিলো।
- ১৯৮০ সালের ২১ এপ্রিল ঢাকা প্রেস ক্লাবে তিনজন সংসদ সদস্য (যারা উক্ত ঘটনার অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন) শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দ্রলাল চাকমা ঘটনার বর্ণনা করেন। ১৯৮১ সালে এক লক্ষ বাঙালি পরিবারকে ৫ একর জমি ও নগদ ৩ হাজার ৬ শ টাকা দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।
- ২৬/৬/১৯৮১ সালে বানরাইবাড়ি, বেলতলী ও বেলছড়িতে সেটেলার বাঙালিরা প্রত্যক্ষ সেনা মদদে ৫০০ পাহাড়ি হত্যা করেছিলো এবং পাঁচ হাজার পাহাড়ি ভারতে শরণার্থী হিসেবে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলো।
- ১৯/৯/১৯৮১ সালে ৫০০ জুম্ম ভাই বোনের রক্তের দাগ শুকানোর আগেই পৈশাচিক হিংস্রতায় সেনা এবং সেটেলার মিলিত বাহিনী তেলাফং, আসালং, গৌরাঙ্গপাড়া, তবলছড়ি, বরনালাসহ মোট ৩৫ টি পাহাড়ি গ্রাম আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো যার ফলে

১০০০ জুম্ম নিহত হয়েছিলো, অগণিত পাহাড়ি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো আর বাংলাদেশ সরকার আজো এই ঘটনার কথা অস্বীকার করে এবং পরবর্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ দেয়া হয়েছিলো মাত্র ১৮ ডলার করে।

- ১৯৮৩ সালের ২৬ জুন; ১১, ২৬ ও ২৭ জুলাই এবং ৯, ১০, ১১ আগস্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সেটেলার বাঙালিদের মিলিত বাহিনী গোলাকপতিমাছড়া, মাইচ্ছাছড়া, তারাবনছড়ি, লোগাং, তারাবুনিয়া, মারমাছড়া, জেদেমাছড়া ইত্যাদিতে হামলা চালায়। এতে ৮০০ জন মানুষ হত্যা করা হয় এবং হাজারের উপরে বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পাহাড়িদের পুড়ে যাওয়া এই সব জায়গা পরিষ্কার করে বাঙালি বসতি স্থাপন করা হয়।
- ৩১/০৫/১৯৮৪ সালের ভোরবেলা শান্তিবাহিনী গোরস্থান, ভুষণছড়া ও ছোটহরিণার তিন বিডিআর ক্যাম্প আর ক্যাম্পের কাছের সেটেলারদের গুচ্ছগ্রামে আক্রমণ করে। এতে সরকারি হিসেবে ৩২ জন এবং বেসরকারি হিসেবে ১০০ জনের মত সেটেলার বাঙালি নিহত হয়। এর প্রতিশোধ হিসেবে সেনা-সেটেলার মিলিত বাহিনী, ৩০৫ নং সেনা ব্রিগেড, ২৬নং বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও বিডিআরের (বর্তমান বিজিবি) ১৭ নং ব্যাটালিয়ন মিলে নিরস্ত্র পাহাড়ি গ্রাম (হাটবাড়িয়া, সুগুরী পাড়া, তেরেঙ্গা ঘাট, ভূষণছড়া, গোরস্তান, ভূষণবাঘ ইত্যাদি) আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। সরকারি মতে ৫২ জন আর বেসরকারি মতে ৪০০ পাহাড়ি নিহত হয়েছিলো। এই নিহতদের মাঝে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিলো শিশু ও নারী। অনেক পাহাড়ি নারীকে সেনা দ্বারা গণধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছিলো। আর ৭০০০ পাহাড়ি রিফিউজি হতে বাধ্য হয়েছিলো ভারতে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ১৯৮৪ সালের ৫ জুন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। ১৯৮৪ সালের ২৮ নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থ বিষয়ক সচিব জনাব সুলতান মাহমুদ ও তার তিন সঙ্গিকে বান্দরবানের চিম্বুক রেস্ট হাউস থেকে শান্তিবাহিনী কর্তৃক অপহরণ।
- ১৯৮৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর শান্তিবাহিনীর হামলায় দুইজন সেনাবাহিনী অফিসার নিহত।
- ১৯৮৬ সালের ২৯ এপ্রিল খাগড়াছড়ির পানছড়িতে শান্তিবাহিনী বিডিআর ক্যাম্প আক্রমণ করেছিলো। তার ফলশ্রুতিতে সেনা আর সেটেলাররা সেখানকার গোলাকপতিমাছড়া, কালানাল, ছোট কর্মপাড়া, শান্তিপুর, মিরিজবিল, কেদেরাছড়া, পুজগাং, লোগাং, হাতিমুক্তিপাড়া, নাপিতপাড়া, দেওয়ানপাড়া প্রভৃতি পাহাড়ি গ্রামগুলোর মানুষজনকে একটা মাঠে ডেকে জড়ো করে তাদের উপর নির্বিচারে গুলি করেছিল। লাশ হয়েছিলো ১০০ পাহাড়ি, এমনকি মিরিজবিল এলাকার এক ৭০ বছরের পাহাড়ি বৃদ্ধা পর্যন্ত রেহাই পায় নি।
- পানছড়ির ঠিক একদিন পর ২/৫/১৯৮৬ সালে মাটিরাঙ্গাতে যেই পাহাড়িরা ভারতে পালাচ্ছিলো, সেই নিরস্ত্র দেশত্যাগী মানুষের উপর সেনারা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে ৭০ জন পাহাড়িকে হত্যা করে।



- এই হত্যা যজ্ঞের দুই সপ্তাহ পার হতে না হতেই ১৮ ও ১৯/০৫/১৯৮৬ তাং মাটিরাঙা থেকে প্রায় ২০০ জন ত্রিপুরা নারী পুরুষের দল যারা বাঁচার আশায় শিলছড়ি থেকে ভারতীয় সীমান্তের দিকে পার হচ্ছিলো তারা তাইদং, কুমিল্লাটিলা গ্রামের মাঝামাঝি এক সরু পাহাড়ি পথ পাড়ি দেবার সময় বাংলাদেশ বিডিআর এর ৩১ ব্যাটালিয়নের জোয়ানরা তাদের উপর হামলা চালায়। যার ফলে প্রায় ১৬০ জন পাহাড়ি নিহত হয়, এমনকি গুলির হাত থেকে বেঁচে যাওয়া আহতদেরকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে ও দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ঐ ঘটনায় বেঁচে যাওয়া অল্প কিছু সাক্ষী আজো বেঁচে আছে।
- ৮, ৯, ১০ আগস্ট ১৯৮৮ সালে হিরাচর, শ্রাবটতলী, খাগড়াছড়ি, পাবলাখালীতে আনুমানিক ১০০ পাহাড়ি জুম্মকে নির্মমভাবে হত্যা ও গুম করা হয়। সেনা ও সেটেলারদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয় অনেক পাহাড়ি নারী।
- ৮/৫/১৯৮৯ সালে লংগদুতে তৎকালীন ইউপি চেয়ারম্যান আবদুর রশিদ অজ্ঞাত নামা লোকের হাতে খুন হন। এর দায় চাপানো হয় শান্তিবাহিনীর কাঁধে। এর জের ধরে সেনা সৃষ্ট ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি নামক সশস্ত্র সেটেলারদের দল সেনা মদদে অমানুষিক হত্যাযজ্ঞ চালায়। এতে নিহত হয় ৪০ জন পাহাড়ি। পুড়িয়ে দেয়া হয় বৌদ্ধ মন্দির। এমন কি তৎকালীন সাবেক চেয়ারম্যান অনিল বিকাশ চাকমার স্ত্রী, সন্তান ও নাতিকে পর্যন্ত নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হতে হয়। সেটেলাররা আজো অনিল বিকাশ বাবুর সমস্ত জমি দখল করে রেখেছে।
- ১৯৮৯ সালের ৯ মে খাগড়াছড়ির পানছড়িতে শান্তিবাহিনীর হামলায় ৫ জন বিডিআর সদস্য নিহত।
- ১৯৮৯ সালের ৩১ মে সাবেক সংসদ সদস্য উপেন্দ্রলাল চাকমার ভারতের ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় প্রার্থনা।
- ১৯৯০ সালের ২৫ জুলাই শান্তিবাহিনী রাঙ্গামাটিতে রেডিও রিলে স্টেশনে হামলা চালিয়ে কিছুক্ষণ তা দখল করে রাখে। ১৯৯০ সালের ১৪ অক্টোবর রাঙ্গামাটিতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ১৪ জন পাহাড়ি নারী ধর্ষিত। ১৯৯০ সালের ২৭ ডিসেম্বর পুনর্বাসিত বাঙালি কর্তৃক ৪ পাহাড়ি হত্যা।
- ১৯৯১ সালের ২৪ মার্চ বরকল থেকে ছোটহরিণাগামী যাত্রীবাহী লঞ্চে শান্তিবাহিনীর হামলায় ২ জন পুলিশসহ চারজন নিহত।
- ১৯৯২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মারিশ্যা থেকে রাঙ্গামাটিগামী বোটে দুইটি বোমা বিস্ফোরিত হলে এতে একজন বাঙালি যাত্রী নিহত ও বোটের ড্রাইভার গুরুতর আহত হয়। এই ঘটনার জের ধরে সেটেলার বাঙালিরা পাহাড়ি যাত্রীবাহী বোটে হামলা চালায়। এতে ৩০ জনকে হত্যা করা হয়। ১৪ জনের লাশ পাওয়া যায় এবং বাকি লাশগুলো পানিতে হারিয়ে যায়। দুইজন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য সেই বোটে করে দুটি কেরোসিনের টিন

বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এই থেকে বিস্ফোরণ হলেও বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোতে প্রচার করা হয় শান্তিবাহিনী এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

- ১০ এপ্রিল ১৯৯২ সালে লোগাঙে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। ঘটনার সূত্রপাত : এক পাহাড়ি মহিলা তার গাবাদি পশু চড়াতে গ্রামের অদূরে গিয়েছিলো। সেখানে দুই জন সেটেলার বাঙালি তাকে ধর্ষণ চেষ্টা চালালে এক পাহাড়ি যুবক বাধা দেয় এবং তাকে সেখানেই হত্যা করা হয়। এতে সেই দুই সেটেলার বাঙালিও আহত হয়। আহত সেটেলাররা পার্শ্ববর্তী ক্যাম্পে অভিযোগ করে যে শান্তিবাহিনীরা তাদের হত্যা চেষ্টা করেছে। এর জের ধরে সেনা-সেটেলার দল মিলে প্রায় ১৫০০ পাহাড়ি জনসংখ্যা অধ্যুষিত গুচ্ছ গ্রামগুলোতে হামলা চালায়, এতে করে প্রায় ৪০০ পাহাড়ি নিহত হয়। প্রায় ৮০০ পাহাড়ি বাড়ি-ঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে প্রায় ২০০০ পাহাড়িকে শরণার্থী হতে হয় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে। ২০ এপ্রিল ১৯৯২ খাগড়াছড়ি থেকে ঢাকায় ফিরে ২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি (রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ) কর্তৃক লোগাং হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করে বিবৃতি প্রদান।
- ২৭ এপ্রিল ১৯৯২ বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার লোগাং হত্যাকাণ্ডের স্থান পরিদর্শন করে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী।
- ১৭ নভেম্বর ১৯৯৩ সালে নানিয়াচর বাজারে পাহাড়িদের শান্তিপূর্ণ র‍্যালিতে অতর্কিতে হামলা চালায় সেটেলার বাহিনী। এর নেতৃত্বে ছিলো সেটেলারদের সংগঠন পার্বত্য গণপরিষদের নেতা মো. আইয়ুব হোসাইন এবং তদানীন্তন বুড়িঘাট ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ। পাহাড়ি ছাত্ররা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে পার্শ্ববর্তী সেনা ক্যাম্প থেকে পাহাড়ি ছাত্রদের উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালানো হয়। এতে নিহত হয় ২৯ জন পাহাড়ি আর আহত হয় শতাধিক।
- ১৯৯৫ সালের ১৫ মার্চ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পুনর্বাসিত বাঙালিদের সংগঠন পার্বত্য গণপরিষদের হরতাল আহ্বান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মিছিলে হামলা। ৪ জন পাহাড়ি ছাত্রের মৃত্যু, ২৮ জন পাহাড়ি আহত এবং ২৪৭ টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।
- ১৯৯৬ সালের ১১ জুলাই রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থানার লাইল্যেঘোনা থেকে হিলউইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণ। ১৯৯৬ সালের ২৬ জুলাই ৯ বাঙালি অপহৃত।
- ১৯৯৬ সালের ৭ আগস্ট রাঙ্গামটির কাউখালি থানার ওসিসহ ৬০ জন বাসযাত্রী অপহৃত।
- ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।

১৯৮১ সালে এক লক্ষ বাঙালি পরিবারকে ৫ একর জমি ও মাসিক রেশনের প্রতিশ্রুতিতে



পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করা হয়, জমির দলিলও সেভাবেই দেওয়া হয়। কিন্তু আদৌ কি পাহাড়িদের বসবাসের জমি বাদে এই পুনর্বাসন করা বাঙালিদের জন্য ৫ একর জমি ছিল ? না, ছিল না। পুনর্বাসিত সেই বাঙালিটি গিয়ে দেখে তার দলিলের নির্দেশিত জায়গায় বসবাস করছে কোন এক নাক চেপ্টা পাহাড়ি। আর দলিল দেওয়ার সময় বাঙালিটিকে বুঝিয়ে দেওয়া হল "দেশ আমার, মাটি আমার"। তাছাড়া বাঙালিদের মধ্যে বিশেষ করে মুসলিম বাঙালিদের অনেকের মধ্যে পাহাড়ি বিদ্বেষী মনোভাব আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল যার প্রমাণ পাওয়া যায় এম. এন. লারমার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা প্রধানের মাধ্যমে। আগেকার দিনে হিন্দু-মুসলিম একে অপরকে যেভাবে নাক সিটকে চলত তখনকার মুসলিম বাঙালিরাও পাহাড়িদেরকে নিম্নশ্রেণীর জাত মনে করে নাক সিটকে চলত। কারণ এরা সাপ খায়, ব্যাঙ খায়। এদের সাথে চলা মানে জাত খোয়ানো। পাহাড়িরা অন্য দেশ থেকে এই দেশে এসে বসবাস শুরু করেছে। এই দেশ বাঙালির, নয় কোন অন্য দেশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা নাক চেপ্টা পাহাড়ির। যার প্রমাণ আমরা পাই শ্রদ্ধেয় পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল কর্তৃক তৈরিকৃত ডকুমেন্টারি "কর্ণফুলির কান্না"তে। এখানে আশির দশকে কুমিল্লা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত জনৈক বাঙালি বলেন, "পাহাড়িরা আমাদের সাথে গেঞ্জাম করে, বলে এখান থেকে চলে যেতে হবে। এই দেশ আমার, আর ওরা বিদেশ থেইকা আইসা বলে এই জমি তাদের। সরকার কি এগুলো দেখে না? তারপর পরিচালক প্রশ্ন করেন তাহলে পাহাড়িদের দেশ কোথায়? জনৈক বাঙালির ক্রুদ্ধ উত্তর : থাইলন, থাইলন। তাদের দেশ হল থাইলন (থাইল্যান্ড)। এই হল ব্রেইন ওয়াশ আর উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী মানসিকতা। ফলে শুরু হল পাহাড়ি আর সেটেলার বাঙালি দ্বন্দ্ব। সেটেলার বা পুনর্বাসিত বাঙালিটি সরকারের দেওয়া জমির দলিল দেখিয়ে পাহাড়িটিকে উদ্দেশ্য করে বলছে এই জমি আমার। আর পাহাড়িটি তার ভোগ-দখলি স্বত্বের দলিল দেখিয়ে বলছে চৌদ্দ পুরুষ ধরে বসবাস করছি, এই জমি আমার। ফলে অনিবার্যভাবে পাহাড়ি আর সেটেলার বাঙালি মারামারি বেধে গেল। কিন্তু পাহাড়িটির জোর কম, রাষ্ট্র নেই পাশে। অন্য দিকে বাঙালিটির সব আছে। আইন আছে, রাষ্ট্র আছে, আর্মি আছে, পুলিশ আছে, দলিল আছে। ফলে অবধারিতভাবে পাহাড়ি পরিবারটি উচ্ছেদ হয়ে গেল। বাঁচার প্রয়োজনে পাহাড়ি পরিবারটি আরো বেশি করে জঙ্গলমুখী হল। এখানেও বাধা আসল। বন বিভাগ বলছে এই জমি আমার, তুমি এখানে বসবাস করতে পারবে না। সেটেলার বাঙালিরা সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে শুরু করল পাহাড়িদের উপর হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ। ফলে এইসব কারণে পাহাড়িদের মনেও ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকল আর সৃষ্টি হল সেটেলার বাঙালি বিরোধী মনোভাব। পাহাড়িদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে এই সব গণহত্যা, বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ, পাহাড়ি নারীদের ধর্ষণ, বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি। অন্যদিকে, বাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ মদদ দিয়েছে বিভিন্ন সরকার ও উগ্র ধর্মান্ধ বিদেশি শক্তি। এভাবেই পাহাড়ি আর বাঙালিদের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সূত্রপাত। পাহাড়িরা দিন দিন নিজ ভূমিতে হয়েছে পরবাসী, আর বাঙালি জনসংখ্যা বেড়েছে হু হু করে জ্যামিতিক হারে। সেই ১৯৪১ সালে পাহাড়ি-বাঙালি জনসংখ্যার অনুপাত কত ছিল আর বর্তমানে কোন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে তা সর্বশেষ আদমশুমারি ফলাফলের দিকে তাকালেই ব্যাপারটা আরো বেশি পরিষ্কার হবে।

**পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা (আদমশুমারি ২০১১)**

মোট: ১৬ লাখ ৬৩ হাজার ২১৪ জন

আদিবাসি/পাহাড়ি/জুম্ম জনসংখ্যা: ৮ লাখ ৫৬ হাজার ৫৪১ জন

বাঙালি জনসংখ্যা: ৮ লাখ ০৬ হাজার ৬৭৩ জন

**রাঙামাটি**

মোট: ৬ লাখ ২০ হাজার ২১৪ জন

আদিবাসী/পাহাড়ি/জুম্ম: ৩ লাখ ৬৫ হাজার ১৫৩ জন

বাঙালি: ২ লাখ ৫৫ হাজার ৬১ জন

**বান্দরবান**

মোট: ৪ লাখ ৪ হাজার ৩৩ জন

আদিবাসী/পাহাড়ি/জুম্ম : ১ লাখ ৭২ হাজার ৪০১ জন

বাঙালি: ২ লাখ ৩১ হাজার ৬৩২ জন

**খাগড়াছড়ি**

মোট: ৬ লাখ ৩৮ হাজার ৯৬৭ জন

আদিবাসী/পাহাড়ি/জুম্ম: ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৮৭ জন

বাঙালি: ৩ লাখ ২১ হাজার ৯৮০ জন

জাতিগত নির্মূলীকরণ তত্ত্বের এই কূটকৌশলের ক্ষেত্রে ধর্মীয় উগ্রতা একটি বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে। ইসলামী সাম্রাজ্যবাদ মানসিকতা এই ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে আগুনে ঘি ঢালার মত উসকে দিচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী মুসলিম বাঙালিরা চায় পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য ধর্মের কোন লোক থাকবে না। মুখে সরাসরি এই কথাগুলো উচ্চারণ না করলেও ফেসবুকে সমঅধিকার আন্দোলন, পার্বত্য-বাঙালি ছাত্র পরিষদসহ উগ্র বাঙালিদের বিভিন্ন পেইজ ও গ্রুপে এদের মানসিকতার যথার্থ প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এরা ছোটকাল থেকেই বড় হয় ভুল ইতিহাস জেনে, পাহাড়ি বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে। ২০১৩ সালের বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির এই সময়ে এসেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী শিক্ষিত বাঙালি শ্রেণি মনে করে পাহাড়িরা পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য দেশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। যেখানে শিক্ষিত বাঙালি শ্রেণির একটি অংশ এই ধরণের ইতিহাস শিখে সেখানে অশিক্ষিত বাঙালিরা হুজুগে মাতাল হবে এই ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। পার্বত্য এলাকার বাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা সৃষ্টিতে সামরিক বাহিনী সবচেয়ে বেশি কার্যকরি ভূমিকা রেখেছে। সামরিক বাহিনী শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, সারা বাংলাদেশের বাঙালিদের মধ্যেই পাহাড়ি বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক মানসিকতা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭৫ সালের পর থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে পার্বত্য এলাকার সংবাদ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করেছে। কোন সংবাদ প্রকাশের আগে সেনাবাহিনীর গ্রিন সিগন্যাল পেলেই তারপর সেই সংবাদ প্রকাশ করা যেত। এর সাথে সাথে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে তুলেছিল পদলেহনকারী পেটুয়া সাংবাদিক বাহিনী যেসব



সাংবাদিক সেনাবাহিনীর সহায়তায় আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল জায়গা, বাগান ও অট্টালিকার মালিক। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে ১৯৯৭ সালের আগ পর্যন্ত দেশের মানুষ কোন সময় সঠিক তথ্য পায়নি। যে তথ্য জেনেছে তা সাম্প্রদায়িকতায় দুষ্ট সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট একমুখী সংবাদ। ফলে আজ দেশের বেশিরভাগ মানুষ মনে করে পাহাড়িরা সংগ্রাম করেছিল স্বাধীনতার জন্য, কোন বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে পারে না আর গেলে চাকমারা ধরে ধরে মারে, পাহাড়িরা খুব হিংস্র, পাহাড়িরা বাঙালিদের দেখতে পারে না, পার্বত্য চট্টগ্রামে অঢেল ভূমি পতিত রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব কথা শুধুমাত্র ধারণার উপর ভিত্তি করে নয়, গত ৭ বছরের অধিক সময় ধরে সমতলের বাঙালিদের সাথে মিশে মিশে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইসলামি জঙ্গিদের প্রশিক্ষণের আস্তানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরা পার্বত্য এলাকার মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করছে উগ্র ধর্মান্ধতা। পাহাড়িরা হল বিধর্মী আর বিধর্মীর সাথে বন্ধুত্ব করা পাপ। এরা সাপ, ব্যাঙ, শুয়োর ইত্যাদি হারাম খাবার খায়। তাই এদেরকে এখন মুসলমান বানানো ফরজ কাজ হয়ে গেছে। তার জন্য এরা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র পার্বত্য এলাকার আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর বাধার মুখে পেরে উঠছে না। তা না হলে এত দিনে জোর-জবরদস্তি করে কতজন পাহাড়িকেই যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতো তার হিসেব নেই। জোর করে পেরে উঠবে না জেনে এরা এখন লোভের ফাঁদে ফেলে মুসলিম বানানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে আমরা দেখি বান্দরবানে অবস্থিত "উপজাতীয় মুসলিম উন্নয়ন সংস্থা" কিংবা কিছুদিন আগে ঢাকার সবুজবাগ থানার একটি মাদ্রাসা থেকে উদ্ধারকৃত ১৬ জন ত্রিপুরা শিশু। যাদের পরিবারকে লোভের ফাঁদে ফেলে বাধ্য করা হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণে। বর্তমানে ইসলামী সাম্রাজ্যবাদের কালো থাবা কীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে গ্রাস করছে সেই ব্যাপারে নিচের এই তথ্য থেকে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

২০১১ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডা/বিহার এর সংখ্যা–

| | |
|---|---|
| মজজিদ | : মোট ২২৯৭; খাগড়াছড়ি-৬৯৫; রাঙ্গামাটি-১২১৩; বান্দরবান-৩৮৯ |
| মাদ্রাসা | : মোট ১৫৬২; খাগড়াছড়ি-৮৬৯; রাঙ্গামাটি-৩৫১; বান্দরবান-৩৫২ |
| প্যাগোডা/বিহার | : মোট ১৪৭১; খাগড়াছড়ি-৮১৭; রাঙ্গামাটি-৪৪৯; বান্দরবান-২০৫ |
| মন্দির | : মোট ৪১৫; খাগড়াছড়ি-৩২৪; রাঙ্গামাটি-৬৯; বান্দরবান-১০ |
| গির্জা | : মোট ৩৬৬; খাগড়াছড়ি-১২৫; রাঙ্গামাটি-১২২; বান্দরবান-১১৯ |

১৯৯৭ সালের চুক্তি পাহাড়ি আর বাঙালিদের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব অনেকটা প্রশমিত করতে পারতো। কিন্তু সরকার এই চুক্তিকে নিয়ে ভোটের রাজনীতি করার ফলে চুক্তি হওয়ার দীর্ঘ ১৫ বছর পরেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব কোন অংশে তো কমেনি, বরং বেড়েছে। শান্তিচুক্তির ফলে পাহাড়ে শান্তি আসার কথা থাকলেও শান্তি আসেনি। উপর্যুপরি দেখতে পাই চুক্তির পরেও মহালছড়ি দাঙ্গা, বাবুছড়া দাঙ্গা, দীঘিনালা দাঙ্গা, মেরুং দাঙ্গা, মাটিরাঙ্গা-গুইমারা দাঙ্গা, খাগড়াছড়ি দাঙ্গা, বাঘাইছড়ি দাঙ্গা, রাঙ্গামাটি দাঙ্গা। এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা-ধর্ষণের মধ্যে বেড়ে ওঠা একটা পাহাড়ি শিশু পরবর্তি সময়ে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা পাবে না তো অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা পাবে? এপ্রসঙ্গে বাবুছড়া দাঙ্গার ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা যায়।

আমি তখন উঠতি বয়সের কিশোর। দীঘিনালা থেকে বাবুছড়া ১২ কিলোমিটার দুরত্বের রাস্তা। এর মধ্যে কোন বাঙালি পরিবার নেই। বাবুছড়া বাজারের কাছে বাঙালিদের গুচ্ছগ্রাম আর গুচ্ছ গ্রামের কাছেই পুলিশ ফাঁড়ি। তার আরো কিছু দূরে সেনা ছাউনি। সেটেলার বাঙালিদের এই গুচ্ছগ্রামের আগে পিছে আর কোন বাঙালি বসতি নেই, শুধুমাত্র পুলিশ ফাঁড়ি আর সেনা ক্যাম্প। এই দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা ছিলো এই সেটেলার বাঙালিদের। কিন্তু তার বদলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো পাহাড়িরা। অনেক পাহাড়ির বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আর আহত হয় অনেকে। বিপরীত দিকে কোন সেটেলার বাঙালির বাড়ি পুড়ে যাওয়া বা কেউ আহত হওয়ার কথা শুনিনি। সেদিন এই ঘটনার প্রতক্ষদর্শী কয়েকজনের মুখে শুনেছি, সেনাবাহিনী সেটেলার বাঙালিদেরকে উৎসাহ দিয়েছে পাহাড়িদের বাড়ি পুড়িয়ে দিতে। সেনাবাহিনী অস্ত্র উচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যাতে পাহাড়িরা কোন ব্যারিকেড তৈরি করতে না পারে। আর এই সুযোগে সেটেলার বাঙালিরা ইচ্ছামত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটপাট করতে থাকে নির্বিঘ্নে। সেই দাঙ্গায় আমাদের বাড়ির পাশের এক কাকা মরতে মরতে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে যান। সেদিন ছিল বাবুছড়া বাজারের সাপ্তাহিক বাজার। তিনি জমিতে ফলানো বেগুন বিক্রি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবুছড়া বাজারে। হঠাৎ করে দাঙ্গা শুরু হলে তিনি প্রাণ ভয়ে বেগুনের ঝুড়ি ফেলে রেখে দৌড়ে আশ্রয় নেন একটা দোকানের মধ্যে। কিন্তু বিধিবাম, সেই দোকান ছিল এক সেটেলার বাঙালির। সেই দোকানদার আশ্বাস দিয়েছিলেন কিছু হবে না, আপনি নিরাপদে চলে যেতে পারবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেই দোকানদার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে এসে দোকানের মধ্য থেকে সেই কাকাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে দা দিয়ে মাথায়, সারা গায়ে কোপাতে থাকে। পরে মৃত মনে করে মাইনি নদীতে ফেলে দেয়। সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় চট্টগ্রাম মেডিকেলে। চট্টগ্রাম মেডিকেলে মৃত্যুর সাথে অনেকদিন পাঞ্জা লড়ে ফিরে আসেন মৃত্যুর মুখ থেকে। এই ঘটনার অনেকদিন পরে এক বাঙালি আইসক্রিমওয়ালা সেই কাকার বাড়ির পাশ দিয়ে আইসক্রিম বিক্রি করতে করতে যাচ্ছিল। সেই বাঙালি আইসক্রিমওয়ালাকে দেখে একটা দা দিয়ে তেড়ে যান মারার জন্য। পরে বাড়ির পাশের আত্মীয়-স্বজন কোনরকমে বুঝিয়ে শান্ত করে এই বলে যে, "তোমাকে মেরেছে অন্যরা, তাদের প্রতিশোধ তুমি এর উপর দিয়ে নিতে চাইছ কেন"? এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপিত হচ্ছে কীভাবে। যখন একটা পাহাড়ি, বাঙালিদের দেওয়া আগুনে তার বাড়ি-ঘর হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়, যখন বাঙালিদের দ্বারা কোন পাহাড়ি নারী ধর্ষিত হয় তখন তার বাবা-ভাইয়ের কাছে অসাম্প্রদায়িক চেতনা আশা করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। এই সব ধর্ষণ, খুন বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা হলে তখন হয়তো বলা যেত এতে পাহাড়িদের দোষ আছে, সাম্প্রদায়িক চেতনা আছে। কিন্তু যে ঘটনাগুলো বছরের পর বছর দেখতে দেখতে একটা পাহাড়ি ছেলে বড় হয় তখন সেই ছেলেটির চোখে যদি বাঙালি বিদ্বেষের আগুন খেলা করে তাতে দোষ ছেলেটিকে দেওয়া যায় না। এর জন্য সম্পূর্ণ দোষ বর্তায় রাষ্ট্রের উপর। কারণ রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে পাহাড়ি ছেলেটিকে একটি অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ দিতে। যেখানে রাষ্ট্রই তার সাথে বৈমাত্রেয়, দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মত ব্যবহার করে সেখানে পাহাড়িটির সহিংস পথ বেছে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। পাহাড়িদের উপর



পরিচালিত এতগুলো হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটের কোন সুষ্ঠু বিচার আজ পর্যন্ত কোন পাহাড়ি পেয়েছে বলে শোনা যায় নি। রাষ্ট্র যদি পুরো একটা জাতির সাথে বৈমাত্রেয় আচরণ করে, আইন শুধু বাঙালিদের জন্য এমন মনোভাব পোষণ করে তাহলে সেখানে পাহাড়িদের সহিংস পথ বেছে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। পাহাড়িরা সাম্প্রদায়িক হয়-হচ্ছে ঘটনার ভুক্তভোগী হিসেবে। বাঙালিদের ক্ষেত্রে এই 'ভুক্তভোগী' কথাটি তেমন একটা প্রযোজ্য নয়। তবে এই বাঙালিরাও যে একেবারেই ভুক্তভোগী নয় সেই কথাটিও বলা যাবে না। কথায় আছে, "নগরে আগুন লাগলে দেবালয় এড়ায় না"। এই সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পাহাড়িরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাঙালিরাও কম-বেশি ক্ষতির শিকার হয়। সেটেলার বাঙালিদের দেওয়া আগুনে বাড়ি-ঘর হারিয়ে নিঃস্ব হওয়া, ধর্ষিত হওয়া পাহাড়ি মেয়েটির বাবা-ভাই নিশ্চয় সারাদিন বসে বসে বিলাপ করবে না। তারাও চেষ্টা চালাবে প্রতিশোধ নেওয়ার। এই প্রতিশোধ চেষ্টা সফল হলে হয়তো আগুন জ্বলবে কোন বাঙালির বাড়িতে। যেই বাঙালিটির বাড়ি পুড়ে যাবে তার মনেও তখন সৃষ্টি হবে পাহাড়ি বিদ্বেষী মনোভাব। সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির এই চক্রাকার ঘুর্ণন চলছে সেই ১৯৮০ সালের পর থেকে। তবে আজ পর্যন্ত পাহাড়িদের কাছে কোন বাঙালি নারী ধর্ষিত হওয়া দূরে থাক কোন বাঙালি নারী সামান্য যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে শোনা যায়নি। অথচ পাহাড়ি নারীরা বছরের পর বছর ধরে বাঙালিদের যৌন লালসার শিকারে পরিণত হচ্ছে। যেই পাহাড়ি সমাজের মধ্যে ধর্ষণ বলে কোন ব্যাপার ছিল না, সেই পাহাড়ি নারীরাই আজ ধর্ষিত হচ্ছে বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে। পাহাড়িরা নারী-পুরুষ একসাথে মিলেমিশে ক্ষেতে-খামারে-জুমে কাজ করে, বৈসাবিসহ সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একসাথে মিলেমিশে হাঞ্জি, জগড়া, দোচোয়ানি পান করে অথচ শোনা যায় নি কোন পাহাড়ি রমণী তার প্রতিবেশী অন্য একজন পাহাড়ির দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে।

**২০০৭ থেকে ১০১২ সালের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি নারীদের উপর সহিংসতার চিত্র :**

**Table- 7 : Types of Violence Against Indigenous Women in the CHT (2007-2012)**

| Year | Rape | Killed after rape | Killed / shot dead | Physical assault/ molested | Attempt to rape | Kidnap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 5 | | | | 3 | 1 | 9 |
| 2008 | 2 | | | | | | 2 |
| 2009 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 2010 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 2011 | 10 | 3 | 2 | | 7 | 4 | 26 |
| 2012 | 14 | 3 | 1 | 23 | 12 | 2 | 55 |
| **Total** | **38** | **11** | **4** | **31** | **29** | **9** | **122** |

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িরা বলতে শুধু চাকমা, মারমা নয় এর সাথে জড়িত আছে মুরং, হাজং, পাংখো, বোম, লুসাই, চাক ইত্যাদি। এদের কারো ভাষার সাথে কারোর মিল নেই, অনেক ক্ষেত্রে নেই সংস্কৃতির মধ্যেও মিল। মিল শুধু এক জায়গায়, তা হল এরা সবাই নাক চেপ্টা, চোখ ছোট মঙ্গোলয়েদ গোত্রের মানুষ। এরা সবাই যে যার জাতির জাতীয়তাবাদী চেতনা বহন না করে সবাই মিলে জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনা ধারণ করার ফলে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ধারণ করা বাঙালিদের তুলনায় কম। অনেকগুলো সম্প্রদায় মিলে যখন জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনা ধারণ করে তখন স্বভাবতই তাদের মধ্যে একটা অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি হয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে অনেকগুলো জাতি মিলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা চর্চার ফলে তারা বাংলাদেশের বাঙালিদের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে অসাম্প্রদায়িক। কথায় আছে, "সঙ্গদোষে লোহা ভাসে"। যারা নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করতো বা যে সব স্থায়ী বাঙালি (১৯৮০ সালের আগে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে বসবাস শুরু করা) আছে, তাদের বংশধরদের মধ্যেও আজ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বীজ রোপিত হয়ে গেছে বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে। বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম পালনকারী বাঙালিদের মধ্যে বাঙালিত্বের চেয়ে ইসলামের প্রভাব বেশি থাকার ফলে তাদের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক চেতনা বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যেকার এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব ১৯৯৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী ভুমি ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে অনেকাংশে লাঘব করা যেত। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রদায়িক চেতনাকে সবচেয়ে বেশি জিইয়ে রেখেছে ভূমি বিরোধ আর সেনাশাসন। কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের দীর্ঘ ১৫ বছরেও বিএনপি আর আওয়ামী লীগ সরকার এই ব্যাপারে কোন ধরনের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি, বরং বিভিন্ন বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শান্তি প্রক্রিয়াকে করেছে দীর্ঘায়িত।

**তথ্যসূত্র**


১. দৈনিক পূর্বকোণ ৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

২. জুম্ম সংবাদ বুলেটিন ১০ নভেম্বর ২০০৫

৩. পরিষদ-বিতর্ক রিপোর্ট, খণ্ড ২, সংখ্যা ৯, ২৩ অক্টোবর ১৯৭২

৪. কাপেং ফাউন্ডেশন রিপোর্ট; Types Of Violence Against Indigenous Women In CHT (২০০৭-২০১২)

৫. Bangladesh Buearu of Stastic (ওয়েবসাইট)

৬. Massacre in CHT (http://www.angelfire.com/ab/jumma/massacre.html)




# যুগে যুগে বিদ্রোহ
# শোষণের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের প্রতিরোধ

অজল দেওয়ান

১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে প্রথমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন ব্রিটিশ বণিকদের হাতে কুক্ষিগত হয়। এরপর তারা পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে হত্যা করার মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তারপর শুরু হয় সমগ্র ভারতবর্ষের নতুন ইতিহাস : শোষণ-নির্যাতনের ইতিহাস। যার ফলশ্রুতিতে বাংলায় "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" দুর্ভিক্ষ হয়। ভারতবর্ষ শোষণের মাধ্যমে সঞ্চিত পুঁজি ইংল্যান্ডের বয়ন-শিল্পের বিকাশের পথকে ত্বরান্বিত করে দেয়। ফলে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ঘটে ইংল্যান্ডের 'শিল্প-বিপ্লব'। বাংলা-বিহার তথা সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শোষণ শিল্প-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে থাকে।

ভারতবর্ষের মানুষের উপর ইংরেজদের শোষণ-নির্যাতন চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। সমগ্র দেশ ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুইটি শ্রেণীতে। প্রথমটি **শোষক শ্রেণী :** ইংরেজ এবং জমিদার ও মহাজন-ইজারাদার। দ্বিতীয়টি দেশের আপামর জনগণ যারা শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট অর্থাৎ **শোষিত শ্রেণি**। এই শোষক-শোষিত শ্রেণিদ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ভারত ও বাংলার কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল এই ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। বাংলার আদিবাসীরাও এই ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেনি। ইতিহাসের দিকে আমরা তাকালে দেখতে পাবো সেই সংগ্রামের ইতিহাস। যেমন : পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের গারো জাগরণ, ময়মনসিংহের প্রথম 'পাগলপন্থী' বিদ্রোহ, দ্বিতীয় 'পাগলপন্থী' বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের 'হাতী খেদা' বিদ্রোহ অন্যতম।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আদিবাসীদের এই ইতিহাস আজ ভুলিয়ে দেয়া হচ্ছে। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে তাদের ইতিহাসকে আজ জানতে দেয়া হচ্ছে না। জানতে দেয়া হচ্ছে না সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিদু, কানুর কথা কিংবা চাকমা বিদ্রোহের নায়ক রাজা শের দৌলত খাঁ ও সেনাপতি রামু খাঁ'র কথা। জানতে দেয়া হয় না 'হাতী খেদা' বিদ্রোহের নায়ক হাজং সর্দার মনা'র কথা, গারো বিদ্রোহের নায়ক টিপু, জানকু'র কথা। একটি আদিবাসী ছেলে যে উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হওয়ার পরও যার জানা থাকে না ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সংগ্রামের কথা, বীরত্বের কথা।

সেই ইতিহাসের আজ কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। জানাতে চাই এই দেশের আদিবাসীদের বীরত্বগাথা, অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে তাদের রুখে দাঁড়ানোর কথা।

**চাকমা বিদ্রোহ**

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ১৭৬০ সালের দিকে শুরু হলেও আদিবাসীদের মধ্যে প্রথম বিদ্রোহ রচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসীরা। ১৭৭৬ সালের এই বিদ্রোহ 'চাকমা বিদ্রোহ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও এটি শুধুমাত্র চাকমাদের আন্দোলনের মধ্য সীমাবদ্ধ থাকে নি। বরং দেশকে রক্ষায় এগিয়ে এসেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত অন্য আদিবাসীরাও। ব্রিটিশরা 'ফড়িয়া' নামক একদল শোষকের মাধ্যমে চট্টগ্রাম থেকে কার্পাস বা তুলা আদায় করত। এই ফড়িয়ারা খাজনার ধার্যের অতিরিক্ত তুলা খাজনা হিসেবে আদায় করত। এছাড়াও তারা স্থানীয় বাজারে আদিবাসীদের ঠকিয়ে প্রচুর মুনাফা লাভ করত। পরবর্তী সময়ে আদিবাসীরা এই শোষণের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে। তারা ফড়িয়াদের আক্রমণ করে তাদের ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। ইজারাদাররা ও তাদের কর্মচারীরা পালিয়ে যায় এবং অনেক কর্মচারী বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এই আন্দোলন ব্রিটিশরা দমন করার জন্য সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে এক বাহিনী প্রেরণ করে। আদিবাসীরা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায় এবং ব্রিটিশ ও তাদের তাবেদার ইজারাদারদের উপর অতর্কিত হামলা করতে থাকে। ব্রিটিশরা এরপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে এবং এভাবেই তারা আদিবাসী বিদ্রোহীদের দমন করে। এই বিদ্রোহ থেমে থেমে ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বিদ্রোহের রূপকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বিদ্রোহ রূপে আদিবাসীরা ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বার বার তারা ব্রিটিশ শক্তির কাছে পরাজিত হয়।

**ময়মনসিংহের গারো জাগরণ**

ময়মনসিংহের অধিবাসী গারোরা 'ঝুম' পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের মাধ্যমে ধান ও তুলার চাষ করত এবং সমতল বাজারে এসে তুলা বিনিময় করে লবণসহ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করত। স্থানীয় জমিদাররা নিম্নমূল্যের সামান্য লবণের বিনিময়ে অনেক বেশি তুলা আদায় করত। গারোরা এর প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করলে তাদের উপর অত্যাচার করা হত। এভাবেই গারোরা স্থানীয় জমিদার ও ইজারাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং গারো সর্দার ছপাতি স্বাধীন গারো রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। যদিও পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকার ছলচাতুরির মাধ্যমে তাঁর সেই স্বপ্ন বানচাল করে দেয়।

**ময়মনসিংহের 'হাতি খেদা' বিদ্রোহ**

ময়ময়সিংহের আরেক আদিবাসী গোষ্ঠী হাজংরা পরিশ্রমী, নির্ভীক, সরল, বন্ধুবৎসল ও অতিথিপরায়ণ হিসেবে পরিচিত ছিল। তাছাড়া, তারা হাতী ধরায় বিশেষ দক্ষ বলে তারা স্থানীয় জমিদার ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ফলে, জমিদাররা হাতি ধরার কাজে হাজংদের ব্যবহার করে। খুব বিপজ্জনক পেশা হওয়ার কারণে হাজংরা পরবর্তী সময়ে



আপত্তি জানায়। কিন্তু, জমিদাররা ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদের জোর করে এই পেশায় নিয়োজিত রাখে। এভাবেই হাজংদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয় এবং এভাবেই সূচিত হয় হাজংদের 'হাতি খেদা' বিদ্রোহের পথ।

হাজং সর্দার মনার নেতৃত্বে এই বিদ্রোহে পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলের শোষিত গারোরাও যোগ দেয়। জমিদারদের সাথে সংঘর্ষে মনা সর্দার নিহত হওয়ার পর আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীদের ভয়ে জমিদাররা পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে জমিদাররা প্রতিশোধ গ্রহণপূর্বক বিদ্রোহী হাজংদের উপর তীব্র আক্রমণ করে। দীর্ঘ ৫ বছর সংঘর্ষের পর জমিদাররা বিদ্রোহীদের পরাজিত করে। 'হাতি খেদা' বিদ্রোহ ভারতের কৃষক বিদ্রোহের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

**ময়মনসিংহের প্রথম 'পাগলপন্থী' বিদ্রোহ**

ছপাতির নেতৃত্বে গারো জাগরণের পর জমিদারদের অত্যাচার আরো বেড়ে যায়। মাত্রাতিরিক্ত খাজনা, নানা ট্যাক্স গারোদের উপর আরোপ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৮২৫ সালের এই বিদ্রোহ। গারো ধর্মীয় গুরু টিপুর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ২ বছর পর্যন্ত এই বিদ্রোহ স্থায়ীত্ব হয়। বিদ্রোহ তীব্ররূপ ধারণ করলে ইংরেজ বাহিনী এসে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে। ফলে, বিদ্রোহীরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে।

**২য় 'পাগলপন্থী' গারো বিদ্রোহ**

১৮২৭ সালে ১ম 'পাগলপন্থী' বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর গারো আদিবাসীরা আবার টিপুর সহকর্মী গুমানু সরকারের নেতৃত্বে জমিদার ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়। পরবর্তী সময়ে জানকু ও দোবরাজ পাথর বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। বিদ্রোহীরা জমিদারবাড়ী ও পুলিশ থানা আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ইংরেজ সরকার সেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রেরণ করেন। ম্যাজিস্ট্রেট জমিদার ও পুলিশবাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করে। কিন্তু, বিদ্রোহীদের গেরিলা যুদ্ধের কাছে তারা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়।

এরপর বিদ্রোহীদের দমনে শাসকরা একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠায়। বিদ্রোহীরাও আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়। ইংরেজ বাহিনী তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বিদ্রোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পাহাড়ের মধ্যে পালিয়ে যায় এবং গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করতে থাকে। এতে ইংরেজবাহিনী বিশেষ সুবিধা করতে না পারায় তারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। তারা গারো সর্দারদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের প্রতি তাদের সমর্থন তুলে নেয়ার কথা বলে। নইলে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। এভাবে, বিদ্রোহীরা ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু, জানকু ও দোবরাজের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

**ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ**

গারোরা ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার। তারা বারবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। ২য় 'পাগলপন্থী' বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর গারোরা আবার বিদ্রোহ রচনা করে। ১৮৩৭ সালের এই বিদ্রোহ থেমে থেমে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৪৫ বছর স্থায়ী হয়।

আন্দোলন বারবার ব্যর্থ হওয়ার কারণে গারোরা আন্দোলনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এর সুযোগে জমিদারবর্গ ও মহাজনরা আবার তাদের উপর শোষণ-উৎপীড়ন শুরু করে। মাত্রাতিরিক্ত করের বোঝা গারোরা কোনদিন মেনে নেয়নি। তারা আবার বিদ্রোহের ডাক দেয়। ১৮৩৭, ৪৮, ৬১, ৬৬, ৭১, ৮২ সালে গারোরা বিদ্রোহ করে। তবে, প্রতিবারই তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ১৮৮২ সালের পর গারো অঞ্চলে আর কোন বিদ্রোহের কথা শোনা যায় না।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ করেছিল ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারোরা। গারোদের এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র বাংলা নয়, বরং সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে সংগ্রামের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

**সাঁওতাল বিদ্রোহ**

১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাসে অতুলনীয়। যে শাসন ও শোষণ-উৎপীড়ন হতে পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের সৃষ্টি হয়, ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বা "ভারতের প্রথম ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রাম" সেই শাসন ও শোষণ-উৎপীড়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রেরণা জুগিয়েছিল দুই বছর আগের সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহ।

সাঁওতাল বিদ্রোহে শুধুমাত্র সাঁওতালদেরই অংশগ্রহণ ছিল না, এতে দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের হিন্দু-মুসলমানদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এই অভ্যুত্থানের মূলে ছিল সাঁওতালদের গভীর অর্থনৈতিক বিক্ষোভ। তারা ক্রমশ বাঙালি ও পশ্চিম ভারতের মহাজন ও ব্যবসায়ী কর্তৃক শোষণ ও প্রতারণার শিকার হত। তারা সরলমতি সাঁওতালদের কাছ থেকে অর্থ ও ফসল শোষণ করে কিছুদিনের মধ্যে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়। কিছু অর্থ, চাল বা কিছু জিনিস ঋণ দেয়ার পরিবর্তে তারা সমস্ত জীবনের জন্য সাঁওতালদের ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসত। তাছাড়াও, মহাজনের সুদের হার এত উচ্চ ছিল যে ঋণ শোধ করতে গিয়ে সাঁওতালরা তাদের জমি, ফসল, হালের বলদ এমনকি পরিবারকেও হারাত। এভাবে আরেকটি ধনী মহাজনশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। শোষণ-নিপীড়নের চাপে মরিয়া হয়ে সাঁওতালরা অবশেষে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়।

১৭৫৫ সালের ৭ জুলাই এই বিদ্রোহের শুরু। বিদ্রোহের নায়ক চার ভাই : সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব। সিদু ও কানু কর্তৃক থানার দারোগা হত্যার পরপরই এই বিদ্রোহের সূত্রপাত। এই বিদ্রোহ ধীরে ধীরে বিহার, পাকুড়, মহেশপুরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজরা সাময়িক প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়। বহু ইংরেজ সৈন্য, মহাজন ও জমিদার নিহত হয়। অবশেষে বড়লাটের নির্দেশে বিশাল সামরিক শক্তি জড়ো করা হয় সাঁওতাল বিদ্রোহের আঘাত হতে পূর্ব-ভারতের ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করার জন্য। এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিপরীতে সাঁওতালরা তীর, ধনুক, কুঠার নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়।

এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ বাহিনী অগ্রসর হয় এবং বিদ্রোহীদের সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত



হয়। যুদ্ধে উভয় পক্ষে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরবর্তী সময়ে ইংরেজবাহিনী শত শত সাঁওতাল গ্রাম পুড়িয়ে দেয় এবং নির্বিচারে হত্যা করে হাজার হাজার সাঁওতালী নারী-পুরুষ ও শিশুকে। এরপর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে সাঁওতালদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়। একসময় বিদ্রোহের নায়ক সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব যুদ্ধে নিহত হলে বিদ্রোহীরা হতাশ হয়ে পড়ে। তবুও তারা আত্মসমর্পণ করেনি, বীরের মত যুদ্ধ করে তারা জীবন বিসর্জন দিয়েছিল। এভাবে আস্তে আস্তে বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। বহু সংখ্যক বিদ্রোহীকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়। এভাবেই সাঁওতাল বিদ্রোহের অবসান ঘটে। যদিও আবার বিদ্রোহ জ্বলে ওঠে ১৮৭১ এবং ১৮৮০ সালে।

এছাড়াও ১৮৫০ সালের **টিপ্‌রা-বিদ্রোহ,** ১৮৬৩ সালের **জমাতিয়া বিদ্রোহ**, ১৮৪৪ সালের **কুকি বিদ্রোহ** ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

এভাবেই আদিবাসীরা যুগে যুগে অন্যায়, নিপীড়ন, শোষণের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল নিজেদের মাতৃভূমি, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। আদিবাসীদের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, বাংলার আদিবাসীদের এই বিদ্রোহ পরবর্তী বিদ্রোহের প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস ব্রিটিশ শক্তি পর্যন্ত? স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। এই ইতিহাস আজ বিস্মৃতির পথে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও আদিবাসীদের সংগ্রামের ইতিহাসকে পড়ানো হয় না। দু-এক লাইনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় এই ইতিহাস। এত সংগ্রাম, এত আত্মত্যাগ কীভাবে মাত্র দুই-তিন লাইনের মধ্যে ধারণ করা সম্ভব?

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় যন্ত্রে কোনদিন আদিবাসীদের সংগ্রামের ইতিহাস রক্ষণ-প্রচার তো দূরের কথা, সাংবিধানিক স্বীকৃতিও দেয়া হয় না। নিজেদের অধিকার, অস্তিত্ব, সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলন এখনো শেষ হয়ে যায়নি। এই আন্দোলন আজো অব্যাহত আছে। আমাদের আন্দোলন-সংগ্রামে আদিবাসীদের বিদ্রোহের ইতিহাস অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

## অল্পস্বল্প বচন
### সুমেধ তাপস চাকমা

পুরনো চাকমা গান শুনছি। শ্রদ্ধেয় রাজা দেবাশিস রায়, আল্পনা চাকমা, রণজিৎ দেওয়ান, কালায়ন বাবু থেকে হালের পল্টু দা, প্রিয়াঙ্কা, ফ্রিকুয়েন্সি সিএইচটির গান বাজছে আর মনের মাঝে এক আশ্চর্য নষ্টালজিক অনুভূতি সবকিছুকে ভালো লাগানো দাওয়াইয়ের কাজ করে যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে গৌতম বুদ্ধের সেই বাণীর সত্যতা অনুভব করি "জ্ঞাতিগণের ছায়া সুশীতল।" বাংলা হিন্দি ইংলিশের সফট, রক, মেটাল, হিপহপ, র‍্যাপ যে ধাঁচের গানই শুনি না কেন তা শুধু ক্ষণিকের আনন্দ দেয়; পরম তৃপ্তি মেলে ঐ চাকমা গানের সুরে সুরে! একমাত্র চাকমা গান ঐ গভীর শূন্যতাকে দূর করার কাজটি করে। জুম্ম জাতীয়তাবোধের অবিনশ্বর চেতনা মনের আকাশে সর্বদা উজ্জ্বল, তাকে এই গানের মাধ্যমে ঝালিয়ে চেতনাকে সদা জাগ্রত রাখি। গানের মাঝে আমার অতীত খুঁজে পাই, খুঁজে পাই পাহাড়ি রাস্তা ধরে হাঁটার দিনগুনগুলো। সমতলের ছাত্রজীবন কেন যেন প্রবাসী প্রবাসী লাগে!

জানি না বিদেশের ওরা কিভাবে থাকে! হিল চাদিগাঙের মাটি যতই গরম হোক তার বাতাস যতই ভারী হোক কিংবা তার উপর দিয়ে যতই হিংসার দাবানল বয়ে যাক তাকে বাদে চিন্তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হিল চাদিগাঙ আমার ঘর, ঘর শান্ত থাকলে মনে শান্তি থাকে, ঘর পুড়লে মন দাউ দাউ করে জ্বলে সবকিছুকে পুড়িয়ে দিতে চায়! দশক দশক ধরে ঘরপোড়া পাহাড়ি জুম্ম পোড়া ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে; সমবেদনা দূরের কথা কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। সমতলের মানুষ এবং বিশ্বে তার পরিচিতি নানান ধরনের নানান কিসিমের। উপজাতি, বিচ্ছিন্নতাবাদী, বর্বর জংলি প্রভৃতি নানান বিকৃত অভিধা দিয়ে আমাদের পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার অপচেষ্টা চলে। ফলস্বরূপ বাঙলার মানুষ দেখে একদল অশিক্ষিত মূর্খ উপজাতীয় জংলি দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলকে (জংলী-প্রবণ এলাকা হলেও সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে সব সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়!) দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব-তিমুর টাইপের একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে চায়! (সোনারবাংলা ডট কম এবং নয়া দিগন্তের পেইড বুড়ো বুদ্ধিবেশ্যা এবনে গোলাম সামাদ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জাঁদরেল ব্রিগেডিয়ারগণের মস্তিষ্কনিঃসৃত ফ্যান্টাসি তত্ত্ব!) বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি লালনকারীরা কখনই স্বীকার করে না দেশে আদিবাসি আছে বরং রাষ্ট্রীয় 'পদ্মফুল' দিপুমণি তাদের উপজাতি হিসেবে মিডিয়ায় ঘোষণা দেয়, জাতিসংঘে দেশের প্রতিনিধি



"আদিবাসি নাই" বলে ILO অজুহাত এনে জনসংখ্যার একটি বাচনিক গায়েব করে দেন। তখন ফেসবুক বন্ধু কল্লোল মুস্তফা ভাইয়ের উক্তিটি দেখাতে হয়,"তাদের উৎস আসাম-বার্মা-মঙ্গোলিয়া-চাদের দেশ যাই হোক না কেন, যেসব অঞ্চলে তারা জনগোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করছেন সেসব অঞ্চলের তারাই আদিবাসি। তারাই প্রথম ঐ সব অঞ্চলকে বসবাসযোগ্য করেন এবং বসতি স্থাপন করেন। যেমন রাঙ্গামাটি বান্দরবান খাগড়াছড়ি এলাকায় বাঙালিরা নয় পাহাড়িরাই প্রথম বসতি স্থাপন করেন অর্থাৎ সেসব অঞ্চলে তারা আক্ষরিক অর্থেই "আদিবাসি"। আজ থেকে ৫০ বছর আগেও পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশেরও বেশি ছিলেন চাকমা, মারমাসহ পাহাড়িরা। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে পরবর্তীতে বাঙালি দরিদ্র মানুষকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সেই আদিবাসীদের বসতি-পাহাড়- বনাঞ্চলে উপনিবেশিক কায়দায় দখলিস্বত্ত্ব কায়েম করা হয়েছে যার ফলে আদিবাসী পাহাড়িরা তাদের নিজভূমে পরবাসী। আবার "আদিবাসী" অভিধাটি একটি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অভিধা যার সাথে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ও অধিকারের প্রশ্ন জড়িত। আদিবাসী হতে গেলে শুধু আদিতে বসবাসই যথেষ্ট নয় কিংবা আদিতে বসবাস জরুরী নয়- আদিবাসিত্বের জন্য জরুরী হলো নৃতাত্ত্বিক জাতি হিসেবে প্রান্তিকীকৃত হওয়া, দখলকৃত হওয়া, দমিত হওয়া ইত্যাদি অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য হওয়া- বাংলাদেশের বাঙালিরা জাতি হিসেবে প্রান্তিক নন, তাই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও বাঙালিদের জন্য জাতিসংঘ কিংবা আইএলও নির্ধারিত আদিবাসী বা ইন্ডিজেনাস অভিধা প্রযোজ্য নয়। জাতিসংঘ/আইএলও নির্ধারিত সংজ্ঞা অনুসারে কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বহিরাগত ভিন্ন জাতির লোকদের দ্বারা দখলকৃত হওয়ার আগে থেকে যারা সেই অঞ্চলে বসবাস করছিলো কিংবা যারা দখলদার আধিপত্যকামী সামাজিক সংস্কৃতিক অর্থনৈতিক রীতিনীতির বিপরীতে নিজস্ব সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক রীতি নীতি ও ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করছে কিংবা স্রেফ যারা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে চায় এবং অন্যান্য আদিবাসীদের স্বীকৃতি প্রাপ্ত তারাই "আদিবাসী"। শুধু শব্দগত অভিধা হিসেবে আদিবাসী স্বীকৃতিই নয়, যে কোন জাতি/জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, নিজেদের যৌথ ইচ্ছা অনুসারে নিজ বাসভূমি, বন, পাহাড়, প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারের লড়াই প্রত্যেক মুক্তিকামী মানুষের নিজস্ব লড়াই।"বই-ল-আর্টিকেল পড়া জ্ঞানী নই, ঐ আদিবাসি-উপজাতি বিতর্কে আর এগোলাম না, সামাদের কথা বলি। সামাদদের মত ইতিহাস ধর্ষকেরা পালিত হয় ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার কতিপয় বুদ্ধিবেশ্যাসহ প্রশাসন-সরকারের আড়ালে থাকা বাংলাদেশী নামধারী কুলাঙ্গার পাকিমনা ছিদ্রান্বেষী বুদ্ধিজীবী নামক পরজীবী যারা একদিকে ধর্মকে ঢাল বানায় অন্যদিকে সংখ্যালঘু অংশের উপর ভোট-রাজনীতি করে বেড়ায় তাদের পৃষ্ঠপোষকতায়! এদের মুখে প্রগতি আর মনে দুর্নীতি-বৈষম্যের রাজনীতি! এই মুহূর্তে দেশে যুদ্ধাপরাধ নিয়ে ব্যাপক সহিংসতা চলছে। সংখ্যালঘুর বাড়িতে বাড়িতে আগুন জ্বলছে এমনকি লাশও পড়ছে। কিন্তু এ নিয়ে প্রশাসন বা ক্ষমতাসীন দলের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই! সংখ্যালঘু আবাস চিহ্নিত করে হামলা

হওয়ার পরেও তাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ হতে কার্যত কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না। আক্রান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই বাঁচতে পাড়ি জমাচ্ছেন ভারত সীমান্তে। আর কদিন পরেই আওয়ামী সরকারের মেয়াদ শেষ হলে এই হিন্দু সমাজের দ্বারে দ্বারে গিয়েই নির্লজ্জের মত ভোট চাইবে জনপ্রিয় সব আওয়ামী নেতা! হায় রে পলিটিক্স! নিতে শুষে নেব কিন্তু কিছুই দেব না! যেই ভোটের উপর দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ আজ এই পর্যায়ে সেই ভোটদাতাদের দিকে নজরই নেই! শুধু বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশার বাণী শুনিয়ে শুনিয়ে কান পচিয়ে দিয়ে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর ভোট আদায় করে নেয়াটা এদেশে একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। রহিমের দেশে রাম-রাধামনেরা জন্মপাপী, দেশ তাদের হয়েও নয়! সংখ্যালঘুদের জন্য এদেশে দুটো শর্ত খোলা রাখা হয়েছে,

**এক. হয় বাঙালি হয়ে যাও**

**নয়**

**দুই. ধর্মান্তরিত হয়ে যাও**

বাস্তবে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু উভয়কে দ্বিতীয় শর্তের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, কেউই নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। ধর্মান্তর অন্যথায় দেশান্তরকে নিত্যনতুন রূপে তাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। একটা মানুষের পক্ষে সারাজীবন অত্যাচার সহ্য করা সম্ভব নয়। হয় সে প্রতিবাদ করছে, না হয় পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে শিকার হয়ে ভোটশিকারির হাতে ধরা দিচ্ছে প্রতিকারের আশায়; কিন্তু প্রতিকার মিলছে না। আর সংখ্যালঘু তো কোটি কোটি মানুষের তুলনায় নস্যি! তাই এইসব বাস্তবচিত্র মিডিয়া সুশীলের প্রবন্ধে আসে না, টকশোর মাত্রায় ঠাই পায় না কিংবা বড় বড় এনজিওয়ালার রেফারেন্সে বিশদভাবে থাকে না। থাকে বিশ্বজিৎ, মরিয়ম মুরমু, তুমাছিং, সুজাতার লাশে হতাশার রিফ্লেকশন হয়ে! এদেশে সংখ্যালঘুকে বারবার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে যেতে হয় সে অধিকারবঞ্চিত, শোষিত, জীবন্মৃত! ১৫ বছরেও শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন হয় না উপরন্তু কোর্টকাছারির ফ্যাসাদে জড়িয়ে একে বৈধ-অবৈধের প্যাচালে ঘুরিয়ে সরকারবাবুরা নানা ক্যাচাল পেরে যায়। এই শান্তিচুক্তি এবং পূর্ণস্বায়ত্বশাসনকে অনেক আমলাও বলেন বিচ্ছিন্নতাবাদ! তাদের প্রতি প্রশ্ন রাখি, ছয়দফা কি তাহলে বিচ্ছিন্নতাবাদ নয়? প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। বাঙালি পাকিস্তানের কাছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করলে আমরাও বাদ যাই কেন? আমাদের দোষ কি? আমরা তো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নয় বরং দেশের জনগণ হিসেবে নিজ বাস্তুভিটা-সম্পদের সুরক্ষাটা চাইছি! তবে তা কেন হারাম হবে? গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে জুম্মর এই দাবিকে কেন অগ্রাহ্য কিংবা প্রতিক্রিয়াশিলতার দৃষ্টিতে নেয়া হবে? জবাব চাই!

অধিকার কেউ কাউকে দেয় না! আমাদের প্রাপ্য অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদেরই আদায় করতে হবে। এম এন লারমার দেখানো স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রয়োজন দৃঢ় জাতীয় চেতনা, সংগ্রামী মনোভাব। জুম্ম সমাজকে আরও অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের প্রয়োজনে রাস্তায় নামতে হবে, অনলাইনের



মাধ্যমে গড়তে হবে বিশাল জনমত। আমাদের বিরুদ্ধে চলা নানান অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে, সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা অতিমাত্রায় পিসিপিনির্ভর হয়ে পড়েছি। আমাদের মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক দল শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই জবাব দিতে সক্ষম। সামাজিক ইস্যুতে সুফল পেতে হলে নির্দলীয় কমিউনিটি যোগাযোগের মাধ্যম যেমন পাঠাগার, ক্লাবের উপর জোর দিতে হবে। সমাজে শুধু রাজনীতিনির্ভর আন্দোলন হলেই সে সমাজ টিকে থাকবে না, সমাজের মানুষের সচেতনতাই মূল কথা। সচেতন সমাজ ছাড়া এই অচলাবস্থা দূরীকরণ একা রাজনীতির পক্ষে সম্ভব নয়। তাই রাজনীতির উপর প্রেসার না দিয়ে সমাজের গণ্যমান্য এবং সাধারণকে নিজ সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য নিয়ে ভাবতে হবে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে সবদিক দিয়ে। কারো অপেক্ষায় সরকারের পানে চেয়ে না থেকে সমাজ গড়ার জন্য জাগরণ শুরু করতে হবে নিজ হাতেই। নিজেকে আগে বদলে নিয়ে বদলাই সমাজটাকে। তরুণ প্রজন্ম সমাজ গড়তে এগিয়ে আসুক, প্রগতির শিখা ছড়িয়ে যাক সমাজের কোনায় কোনায়– এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

# শিকড়বিহীন আদিবাসী : অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্রতা

## অজল দেওয়ান

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রায় সবার কম-বেশি জানা। প্রাইমারি স্কুল থেকে হাই স্কুল পর্যন্ত গড়গড়িয়ে মুখস্ত করেছি বাংলার ইতিহাস, ক্ষুব্ধ হয়েছি ব্রিটিশদের রাজনৈতিক কূটচাল দেখে, কষ্টে বুক ফেটে গিয়েছে যখন পড়েছি সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয়ের কাহিনী। আবার মনের অজান্তে তৈরি করেছি মীর মদনের বীরত্বগাথা, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জগৎ সিং কিংবা আশফাকউল্লাহ'র সাহসী মুখ অথবা সাভারকর ভাইদের দৃপ্ত শপথ। এ ইতিহাস কি ভুলে থাকা যায়? ভারতবর্ষের ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু, জগৎ সিং, বাসুদেব, মঙ্গল পাণ্ডেসহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়কদের আড়ালে পড়ে কি হারিয়ে যাচ্ছে সিধু, কানু, রামু খাঁ, সর্দার মনাদের বীরত্বগাথা?

জীবনের ১২টি বছর কলুর বলদের মত খেটে পড়াশুনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার দুই বছর পার হলো। ক্যাম্পাসে বাম রাজনীতি করছি, বৈষয়িক পড়াশুনাসহ এই দেশের ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাটি তো আছেই। একদিন হঠাৎ করে একটা ছোট্ট বই খুঁজে পেলাম 'চাকমা বিদ্রোহ' শিরোনামে। দেখে মনে পড়ে গেল ৭ম কি ৮ম শ্রেণীতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক অধ্যায়ের একটি লাইনে "১৭৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ হয়" দেখেছিলাম। তবে কি সময়ের প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে আদিবাসীরাও গর্জে উঠেছিল ব্রিটিশ পরাশক্তির বিরুদ্ধে? উঠেপড়ে লেগে গেলাম বাংলার আদিবাসীদের সংগ্রামের ইতিহাস খোঁজার কাজে। কিন্তু, কোথাও পাওয়া গেল না সেই ইতিহাস। চাকমা বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, গারো বিদ্রোহের কথা আবছা আবছা করে মনে পড়ে গেল। এক বড় ভাইয়ের কাছ থেকে কিছুটা শোনা। কিন্তু, বিস্তৃত করে কিছু জানব তার উপায় যেন নেই। যেন রবি ঠাকুরের 'সোনার তরী' কবিতার মত– নৌকার মাঝি আদিবাসীদের কষ্টে বোনা ধান নিজের নৌকায় তুলে নিতে ভুলে গিয়েছে। মহাকালের আবর্তে হারিয়ে গিয়েছে যেন সেই সোনার ধান।

হায় হায়! পরবর্তী প্রজন্ম খাবে কি? চিন্তা নেই। অন্যদের বীজ দিয়ে ধান বুনে সেটা খাইয়ে দেবো।

মানবে তো?

আলবৎ মানবে। একটু ট্রিকস করতে হবে আরকি।

এভাবেই ক্রমাগত ট্রিকস্ এর হাতে পড়তে পড়তে নিজের অতীত সমৃদ্ধ ইতিহাসকে আজ ভুলতে বসেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাইসহ বন্ধুদের কাছ থেকে খবর নিলাম। সেখানে নাকি



ভারতবর্ষের ইতিহাসই সম্পূর্ণ পড়ানো হয় না। অদ্ভুত কাণ্ড! ব্রিটিশদের কাণ্ডকীর্তি অর্থাৎ তারা কী আইন রচনা করেছিল, বাংলা ও বিহার শোষণের ফলে তাদের কী লাভ হয়েছিল এসবই পড়াশুনার বিষয়বস্তু। কিন্তু, ভারতবর্ষের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা হয় না কোন এক অজ্ঞাত কারণে। আইন প্রণয়নের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন এ্যাক্ট এর কথাও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাহলে আমরা কি মনে করব বাংলাসহ ভারতবর্ষের ইতিহাস জানার ভাল মাধ্যম ৭ম-৮ম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের কিছু অধ্যায়?

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ায় জানি, হাইস্কুলের পরপরই সমাজবিজ্ঞান থেকে ছাত্ররা দূরে সরে যায়। তখন তাদের পড়ার বিষয়বস্তু থাকে বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ। শিক্ষা ব্যবস্থার এত গলদ যে, বিজ্ঞানের ছাত্ররা আর ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি শেখার সুযোগই পায় না। আর জিপিএ সিস্টেম আসার পর অভিভাবকদের চোখ থাকে ভালো রেজাল্টের দিকে। ফলে, তার অন্যদিকে মনযোগ দেয়ার সুযোগ আরো কমে যায়। সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান সেখানে সীমিত।

তবুও ভাল, ভারতবর্ষের ইতিহাস গবেষকদের বিভিন্ন বই আজ জ্ঞানপিপাসুদের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। অথচ, আদিবাসীদের ইতিহাসের সেখানে স্থান হয় না। বরাবরের মতোই তারা থেকে যায় পর্দার অন্তরালে। আমরা আদিবাসীরা এমনই। মাঝে মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করি সেই কাক রূপে যে কোকিলের বাচ্চাকে নিজের বাচ্চা হিসেবে পালনের পর দেখে তার নিজের কিছু নেই। নিজেদের শিকড়কেই আমরা নিজেরা উপড়ে ফেলছি।

আদিবাসীদের মধ্যে আগের চেয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। কিন্তু, সুশিক্ষিতের চেয়ে কুশিক্ষিত হচ্ছে বেশি। সুশীলদের দল দিন দিন ভারি হচ্ছে। আদিবাসীদের সংগ্রামকে এখন শোকেসে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত তারা। তারা নেতৃত্ব তৈরির জন্য সভা-সেমিনার করেন। কোন দিবস এলে কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়, আর হত্যা-নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে একটা প্রতিবাদী মানববন্ধন, সমাবেশের ডাক দেয়া হয়। ব্যস, এই তো। তবে প্রশ্ন একটাই, এতেই কি দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল?

আচ্ছা, সভা-সেমিনার করতে চান ভালো কথা। করুন, বাংলাদেশের আদিবাসীদের সংগ্রামের ইতিহাসের উপর সভা করুন, জানিয়ে দিন বাংলা কোন নির্দিষ্ট জাতির জন্য নয়, বাংলা এদেশের আদিবাসীদের জন্যও যারা নিজেদের প্রাণ দিয়েছিল দেশের স্বাধীনতা অর্জনে। তারা তা করবেন না। কারণ, এতে রাষ্ট্রযন্ত্রসহ তাদের পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠী মন খারাপ করতে পারে। তারা সেটা চান না।

বর্তমান প্রজন্ম তো আস্তে আস্তে নিজেদের অস্তিত্ব নিজের হাতেই হত্যা করছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ হিসেবে দেয়া যায় চ্যানেল আই কর্তৃক 'পার্বত্য লোকজ মেলা'য় নিজেদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এছাড়া দেয়া যায় ফেইসবুকে 'ওমাড়ু প্রডাকশন' ও 'বেইন আলাম' নামক দুইটি পেজের উদাহরণ। নিজেদের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা তো দূরে থাক, নিজেদের সংস্কৃতিকে বিক্রি করে কীভাবে টাকা পয়সা বানানো যায় সেই চিন্তায় বিভোর বর্তমান প্রজন্ম। তারা 'নিজ আলুব্যু নিজে হুরানা'য় যথেষ্ট বিশ্বাসী।

বর্তমান সময়ে শাহবাগে আন্দোলনের জোয়ার বইছে। সিলেটের আন্দোলনে আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু বিতর্কিত অর্থাৎ আমার জাতিসত্তার উপর হুমকিস্বরূপ শ্লোগান যেমন 'তুমি কে, আমি কে, বাঙালি, বাঙালি' দিইনি। আন্দোলনে আমি ছাড়াও অনেক মণিপুরী, খাসিয়া জাতির ছেলে-মেয়ে যোগ দিয়েছে। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম তারা সেই শ্লোগান চিৎকার সহকারে দিচ্ছে। এরপর ওদের সঙ্গে গিয়ে কথা বললাম। তাদের যুক্তি, বাংলাদেশে আছি সুতরাং আমরা বাঙালি। কতটুকু শিকড়বিহীন হলে একজন আদিবাসী ছেলে বা মেয়ে এই কথা বলতে পারে। তারা কি জানে বাংলাদেশের আদিবাসীদের ইতিহাস? অধিকার আদায়ের ইতিহাস? শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইতিহাস?

কথায় আছে, 'ইতিহাস রচনা করে বিজয়ীরাই'। সেখানে বিজিতেরা অছ্যুৎ, বাংলাদেশের আদিবাসীরা বরাবরই অছ্যুৎ হিসেবে থেকেছে। ফলে, তাদের সংগ্রাম, আন্দোলন নিয়ে কোন ইতিহাস রচনা করার কেউ নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি আদিবাসীরাই রচনা করুক নিজেদের সংগ্রামের ইতিহাস। তৃতীয় ব্যক্তির বদৌলতে পাওয়া ইতিহাসের অধ্যায় বন্ধ হয়ে যাক। তবে, কয়েকমাস আগে পাওয়া সুপ্রকাশ রায়ের **"ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম"** বইতে তিনি খুব সুন্দরভাবে বাংলাদেশের আদিবাসীদের সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন। মার্ক্সবাদী হিসেবে পরিচিত এই লেখক অত্যন্ত গভীর যত্নসহকারে ফুটিয়ে তুলেছেন আদিবাসীদের প্রতি শোষণের কাহিনী, তাদের বীরত্বের কাহিনী।

সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন চাকমা বিদ্রোহ, গারো জাগরণ, ময়মনসিংহের 'হাতি খেদা' বিদ্রোহ, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ১ম ও ২য় পাগলপন্থী বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহসহ টিপ্রা, জমাতিয়া, কুকি বিদ্রোহের কথা। যদিও তিনি নাচোলের বিদ্রোহের উল্লেখ করেননি, যেহেতু তা ছিল স্বাধীন ভারতবর্ষের বুকে আদিবাসীদের ১ম শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তিনি শুধুমাত্র দেখিয়েছেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চিত্র।

এই সকল বিদ্রোহ, আন্দোলনের ইতিহাস দেশের বেশিরভাগ আদিবাসীদের অজানা। তারা জানে না, তাদের পূর্বপুরুষরা অধিকার আদায়ে, শোষণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। এটা অনেকটা রিফ্লেকস ও উদ্দীপকের মতো। ১ম রিফ্লেকস পরের রিফ্লেকসটির উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। ১ম রিফ্লেকস যদি আমরা ধরি চাকমা বা সাঁওতাল বিদ্রোহ তাহলে অবশ্যই তার পরবর্তী রিফ্লেকস হিসেবে আমরা পাব আদিবাসীদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন এবং এক্ষেত্রে উদ্দীপক হিসেবে থাকবে চাকমা বা সাঁওতাল বিদ্রোহ। কিন্তু, রিফ্লেকস-উদ্দীপকের এই যোগসূত্রটি কেটে দেয়া হয়েছে। ফলে, আজ আমরা আমাদের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। নিজেদের কর্মকাণ্ড এখন নিজেদের উপরই বুমেরাং হয়ে আসছে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারোরা ছিল অনেকটা স্বাধীনচেতা প্রকৃতির। নিজেদের মত করে নিজেরা বাঁচত, জীবন নির্বাহ করত। ব্রিটিশদের কারণে সেই স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ায় তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। ব্রিটিশরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও তাদের দমাতে পারেনি। গারোদের বিদ্রোহ প্রায় ১৮২৫ সালের দিকে শুরু হয়ে ক্রমাগত দমন-পীড়নের শিকার হয়েও



তা ১৮৮০ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। পরে ১৮৮২ সালের দিকে নেতৃত্বের শূন্যতা, নিরীহ গারোদের উপর প্রবল অত্যাচার এসবের কারণে ধীরে ধীরে এই বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। প্রথমে ১ম ও ২য় পাগলপন্থী অর্থাৎ বাউল ধর্মে দীক্ষিত গারোদের মাধ্যমে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং পরবর্তী সময়ে সমগ্র গারো জাতি সংগ্রামে অংশ নেয়। প্রথমে ধর্মগুরু টিপু এবং পরে জানকু ও দোবরাজ পাথর বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন।

এভাবে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথাও আমরা বলতে পারি। এই বিদ্রোহ ভারতের ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রেরণা জুগিয়েছিল। সুপ্রকাশ রায়ের মতে, 'যে শাসন ও শোষণ-উৎপীড়ন হতে পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৃষ্টি হয়, ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বা "ভারতের প্রথম ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা-সংগ্রাম" সেই শাসন ও শোষণ-উৎপীড়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।'

এভাবে কুকি, তিপ্রা, জমাতিয়া, 'হাতি খেদা' বিদ্রোহের হাজংরা ক্রমাগত শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তবে, চাকমা বিদ্রোহ এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রমী। অন্য সকল বিদ্রোহে নিজস্ব জাতিসত্তার অংশগ্রহণ অত্যধিক থাকলেও চাকমা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা একত্রে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। চাকমা রাজা শের দৌলত খাঁর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তাই একে চাকমা বিদ্রোহ নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু, বাস্তবিক অর্থে অন্যসকল বিদ্রোহের চেয়ে চাকমা বিদ্রোহে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ছিল একটু বেশি।

ভারতবর্ষের প্রতিটি বিদ্রোহকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব, প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের পিছনে রয়েছে তাদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন-শোষণ। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, ফরায়েজী-দুদু মিয়ার বিদ্রোহ, সমশের গাজীর বিদ্রোহ, নীলচাষীদের বিদ্রোহের উদাহরণ দেয়া যায়। এই সকল শোষণ-নির্যাতন এসেছিল নিজস্ব জাতিসত্তার উপর আঘাত হিসেবে। ফলে, অনন্যোপায় হয়ে তারা এই বিদ্রোহগুলো সংঘটিত করে।

আদিবাসীদের বিদ্রোহগুলোও প্রায় একই সূত্রে গাঁথা। তারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে, উত্তর-প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে, মাতৃভূমির পরাধীনতা সহ্য করতে না পেরে। এই সকল বিদ্রোহ সফলতার মুখ দেখেনি। কিন্তু ব্রিটিশদের ভিত্তিমূল একটু হলেও কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এই সকল বিদ্রোহের, আন্দোলনের ফলস্বরূপ আমরা পাই স্বাধীন ভারতবর্ষ। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মধ্য দিয়ে যা সম্পন্ন হয়েছিল। এরপর বাংলার আদিবাসীদের উপর চরম বিপর্যয় নেমে আসে। পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা অঞ্চল ডুবে যায় কাপ্তাই বাঁধ দেয়ার কারণে, ফলে বিপুল সংখ্যক আদিবাসী ঘর-বাড়ি, জমি হারিয়ে বাংলাদেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে যায়। এভাবেই ক্রমাগত বঞ্চনার ইতিহাস শুরু। মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাঙালি হয়ে যাওয়ার প্ররোচনা, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়া কর্তৃক সমতলের বাঙালি দ্বারা পার্বত্য অঞ্চলে আগ্রাসন, শান্তিবাহিনীর উত্থান ও সংগ্রাম, অবশেষে পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির অবসান- এই ইতিহাস সাম্প্রতিক সময়ের ইতিহাস। ফলে সবারই কমবেশি জানা।

এরপর শুরু হয় আদিবাসীদের উপর রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণ। নাটোরের সাঁওতাল, ময়মনসিংহের গারোদের জমি বেদখল, খুন-ধর্ষণসহ পার্বত্য অঞ্চলে সেটেলার কর্তৃক রাষ্ট্রের অত্যাচার অব্যাহত আছে। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই, অতীত হতে বর্তমান পর্যন্ত বাংলার আদিবাসীদের ইতিহাস শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস। মিল শুধু এটুকুই। আর অমিলটা বিশাল, যেখানে অতীতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রবণতা ছিল এখন সেটা দাঁড়িয়েছে আপসের সাথে মানিয়ে চলার প্রবণতা।

বর্তমান প্রজন্মের দিকে তাকালে চোখে সর্ষেফুল দেখার উপক্রম হয়। বলিউডি সংস্কৃতি (যেটি আদতে কোন সংস্কৃতিই নয়) আর পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনে পড়ে প্রজন্মের তারুণ্য হারিয়ে যাচ্ছে অতল গহ্বরে। তারা ইতিহাস শুনতে বা পড়তে মনোযোগী নয়, বরং তারা হিন্দি সিরিয়াল, হলিউডি অ্যাকশন মুভি দেখতে ব্যস্ত। আর প্রযুক্তির যুগে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলা হচ্ছে একটা রুমের ভিতর। এভাবেই ব্যক্তিবিচ্ছিন্নতার প্রভাব বাড়ছে। হারিয়ে যাচ্ছে আদিবাসীদের আপসহীন ধারা। এখন বরং সবাই আপস করতে ব্যস্ত। নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য একটু সামান্য সুবিধার বিনিময়ে আপসের পথে আদিবাসীরা হাঁটা শুরু করেছে। ফলে, হারিয়ে যাচ্ছে আপসহীন ধারা, অতীতের সংগ্রাম। এভাবেই ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে শিকড়ের টান।

সংস্কৃতি, আচার, ঐতিহ্যের মাঝেই বিরাজ করে নিজস্ব অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব রক্ষার্থে আমরা কোনভাবেই অতীতকে ভুলে যেতে পারি না। অতীত সঙ্গী করে বর্তমানকে কাজে লাগিয়ে আমাদের হাঁটতে হবে ভবিষ্যতের পথে। অতীতের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম হোক আমাদের আগামীর পথ চলার পাথেয়।



# শুভাশীষ চাকমার স্বপ্ন

## অদ্রি প্রথম

অন্ধকারে হাতড়াতে থাকা শুভাশীষ চাকমা অসহায়ভাবে তার ছেলেকে ডাকতে লাগলো, এই সুজাত, ও সুজাত, কৈ তুই? সুজাত বেশ দূর থেকে ফিসফাস কণ্ঠে সাড়া দিয়ে উঠলো, এই তো আসছি বাবা। শুভাশীষ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল পাঁচখানা ইটের বোঝা মাথায় নিয়ে। একটুও এদিক-ওদিক না নড়ে।

দিনে এক-আধটু দেখলেও রাতে একেবারেই অন্ধ শুভাশীষ। ছোটবেলায় রাতকানা রোগে ধরেছিলো, কিন্তু কেউ তখন আমলে না নেয়ার তার এখন করুণ দশা। এর মাঝে অবশ্য ঢাকায় গিয়ে বেশ ক'বার বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছে সে। কিন্তু দেখানো পর্যন্তই, কারো বিশেষ কোন আশার আলো তাকে বা তার চোখকে উজ্জীবিত করতে পারেনি। দিনে আনি দিনে খাই সংসারে বরঞ্চ তার ঢাকা আর চট্টগ্রামে ডাক্তার দেখানোর প্রক্রিয়াগুলোর সবকটিই বেশ সাংসারিক মনোমালিন্য, ঝুট-ঝামেলার মধ্যে দিয়ে গেছে। সবদিক চিন্তা করে সে এখন চুপ করেই থাকে। মাঝে-সাঝে মদের রঙ আর চোখের জলের রঙ এক হলে একা একাই হাপিত্যাশ করে উঠে। এই কিছুদিন হলো সে আবার একটু একটু করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলো। গ্রামের রাস্তাটা পুরোটাই পাকা হয়ে যাচ্ছে, এখন জিপ গাড়িতে করে লোকজন রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি সরাসরি যাতায়াত করতে পারছে। লোকমুখে শুনেছে বড় বড় ডাক্তার আসবেন, হাসপাতাল হবে। সে এখন স্বপ্ন দেখছে আবার তার চোখগুলো নতুনভাবে নতুন কাউকে দেখানো যায় কিনা। সে এই রাস্তার সাথে চিন্তা করে সে আর কি কি চাইতে পারে। কিছুই মনে আসে না তার। কেবল তার চোখের চিকিৎসা ছাড়া। এইসব নতুন পথ, গাড়ি হয়েছে মাত্র ক'বছরের ব্যবধানে। এই তো ক'দিন আগেও ওরা বাজার করতে যেতো প্রায় ২০ কি.মি. দূরের এক হাটে, তাও হপ্তায় মাত্র এক বার বসে। শুভাশীষ চাকমার অনেক কষ্ট হতো একছরা কলা বা এক হাল্লোং আদা অথবা হলুদ নিয়ে যেতে। এখন বেশ লাগে, গাড়িতে তুলে দিলেই হলো। বাজারে তার কাজ বেশি কিছু নয়, মাল বিক্রি আর টুকিটাকি সাংসারিক জিনিসপত্রাদি কেনার পর যা টাকা থাকে তা দিয়ে "মলি" কিনে নিয়ে আসা। বাসায়ই বানানো হতো "দোচোয়ানি" এই মলি দিয়ে। এখন তো দেখা যায় রীতিমত কিনতেই পাওয়া যায়! কষ্ট করে আর বানানো লাগে না। টাকা দিলেই সব মেলে। অথচ তারা কোনদিন কিনে খায়নি। বাসা থেকে বাসা দাওয়াত নেয়া আর দেয়া হতো, এভাবেই তারা সারাজীবন ধরে প্রচলিত করে এসেছে "দোচোয়ানি" খাওয়ার প্রথা। তবে শুভাশীষের রেডিমেট বানানো দোচোয়ানি ভালো লাগে না, পানসা লাগে, খেয়েছিলো

একবার তার বন্ধু চুপ্পি বাপের সাথে। তবে তার ঘরে বানানোটাই তার কাছে বেশ দগ লাগে। শুভাশীষ চাকমা অবাক হয়ে ভাবে অনেককিছু। আদামে অনেক পরিবর্তন এসেছে। অনেককিছু। আদামের সবার ঘরে ঘরে এখন সোলার বসানো। সবাই টিভি দেখে নিজের বাসায় বসে, অথচ কদিনই-বা হলো ওরা সবাই দল বেঁধে টিভি দেখতে যেতো কার্বারি ঘরে। দু'এক বছরে বাইরে থেকে লোকজন এসেছে প্রচুর, বিভিন্ন পণ্যের পসরা নিয়ে বসেছে তারা। জমির দামও বেড়েছে হু হু করে। রাস্তাটা হবার আগে সে এক কানি ভুঁই বেচেছিলো মাত্র ১৫ হাজারে, এখন সেই জমি হয়েছে ১ লাখ ! তার বিক্রি করা জমিতে একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টার হয়েছে। সেখানে অনেক মানুষজন যায় নানান রোগ পরীক্ষা করতে। সে ও একবার গিয়েছিলো সেখানে, কিন্তু রোগ আর পরীক্ষা করা হয়ে উঠেনি, ডাক্তার দেখাতেই পুরো ৫০০ টাকা শেষ! ডাক্তার সাহেব বেশ ক'টি টেস্ট করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু যেখানে টাকাই নেই সেখানে আবার রোগ পরীক্ষা কিসের। তার খুব বলতে ইচ্ছে করছিলো, এই জমিটা তো আমারি ছিলো, না হয় পুরোনো মালিকানার দাবিতে একবার ফ্রী রোগ পরীক্ষা করলেন আমাদের, আমরা তো এই গ্রামেরই লোক। বলতে পারে না সে, মুখে বিঁধে থাকে তার সবগুলো কথা। চুপচাপ অসুস্থ বউয়ের হাত ধরে শনের ঘরে তারা ফেরে। সে অবাক হয়ে দেখে শুধুমাত্র তার ঘরটাই শনের, আর সবগুলো ঘর দেখতে না দেখতেই পাকা, সেমি পাকা হয়ে গেছে তরতর করে ! শারীরিক সামর্থ্যটুকুতে তার কমতির প্রশ্রয়ে তার অবস্থা যে দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে সে বুঝতে পারে, সে আরো বুঝতে পারে নিজের গ্রামে সে নিজেই এখন এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরজীবী অদ্ভুত জীব।

সুজাত এসে বাবা বাবা বলে ডাক দিলে সে সম্বিৎ ফিরে পায়। পাঁচখানা ইট নিয়ে সে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে তার ছেলের হাত ধরে। আজ রাতই শেষ রাত । কাল থেকে শুরু হবে তার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া অবহেলে রাস্তাটার কাজ। কাজ শুরু হলে আর ইট চুরি করা যাবে না। আজ রাতেই যা ইট সরানোর তা সরাতে হবে। তার ঘরটা সেমিপাকা করতেই হবে, না হলে সে আর দশজনের সামনে ঠিক বুক উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

*হাল্লোং- মালামাল বহনের ঝুড়ি।
*দোচোয়ানি- চাকমাদের নিজেদের বানানো মদ।
*মলি– "দোচোয়ানি" বানানোর প্রাথমিক এবং প্রথম উপকরণ।
*আদাম- গ্রাম।



# শিশির চাকমার কবিতা

## হ্‌রিঙা মৌনত উধি

বরকল হ্‌রিঙা উযনি উযদে বোদর অনসুর খারকাজ্যা র'ত
আমন' আদামনি এচ্চে কেযান অচিন অচিন
খারকাজ্যা অই চোঘত আন্দল অদ চায়।

কবি দাঙু বীরদাগির আদামানি কেযান সারাল্যা সারাল্যা
সারা আদাম ভিলি সারাআদাম নয়, মানুজর কোল কোলিও
শুনা যায়, এ কোল কোলকোলিত উম নেই,
কানজাবা জুরত্তুন জুরো অই যায়।

বরকল গাঙত্তুন মুরোত উধি তোরবো যাদে যাদে
ছড়াগাঙ তারাবন,
বাঘ কাঙেল' সান দীঘোল হরিঙা মোনত উধি
দীঘোল নিযেচ্ ফেলাদে ফেলাদে
চিত জুরনি আহ্‌বায় আহ্‌বায়
চোখ তাক লয় অজার কাজলঙর বাম
বরকল বাম, চেঙেই বাম
দাঙদাঙ্যা জুম চাব, সারা রান্যা ভুই
পনজাচ্ বজর পর ঝারে ঝারে বাশফুল
পাগলে ধচ্চে বাশ আলাঙ ওলোঙ দিককাবুলা ঝলগা বোয়েরত।
সদরর বান কমলে সজ অই গেল
মন তম্বা অতালেয়া তিরোজ ন' ফুরয়, ন ফুরয়।

## হরিনা পাহাড়ে উঠে
**(বাংলা অনুবাদ)**

বরকল হরিনা যাওয়ার পথে
একটানা বোটের শব্দের দুর্বোধ্যতায় কান ঝালা পালা
বরকলের নদীর পাশের আদিবাসী গ্রামগুলো
আজ কেমন অপরিচিত অপরিচিত মনে হয়।

বন্ধু বীর'র গ্রামখানি কেমন জানি মনে হয় ধর্ষিত
সাড়াশব্দহীনও নয়, মানুষের অস্তিত্বও সরব
কিন্তু মানুষের সাড়াশব্দের মধ্যে তেমন উষ্ণতা নেই
কেমন গভীর নির্জনতায় আকণ্ঠ ডুবে যায়।

বরকল থেকে পাহাড় বেয়ে ওঠা
হাঁটতে হাঁটতে ছরার পাশের তারাবন
বাঘের পিঠের মত দীর্ঘ-উঁচু হরিনা পাহাড়
পাহাড়ের শীর্ষে উঠে
দীর্ঘশ্বাস ফেলে
হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া বাতাসের পরশ
নিমিষেই চোখ যায়
বিস্তীর্ণ কাচালং উপত্যকায়
বরকল উপত্যকা এবং চেঙেই উপত্যকায়।

জড়থর ন্যাড়া জুম পাহাড়
পঞ্চাশ বছর পরে বাঁশ ঝাড়ে বাঁশফুল
রোগাক্রান্ত নিবিড় বাঁশঝাড় আজ কেমন অসহায়
সংকটের আবর্তে প্রাণের টান আজ কেমন ভঙুর
মনের তৃষ্ণা ফুরায় না।



## বেয়াল

এ জুম ও জুম বেড়ানা
মৌন লেজায় তুগুনে তুগুনে বঙানা
রান্যা ঈরি, নুয়্য জুমত ফরঙ অনা
তাগল বারেঙ কাল্লোঙ লাবাক কাবর চাব
বিজ বিজিদি বিজধান
ভাঙা ফুল বারেঙর তলাত সোনার কজফুল
কচ্ উদোঙ উদোঙ বিজোর সম্বল থেঙত হারু বাঙরি
ঐতিহ্যের হুলুঙত কুদুম জুর বান আরেবার চায়।

ঐতিহ্যের সদি ভাঙি মাচ্য দেবেদার গদত
পুজ' পাদি
লুই, তেরা ছেই ধুব সমারে লোই
ছড়া ঈজি ঈজি হরান অই ছড়াথুমত পোরি থানা বেয়াল।

ছড়া ছড়ি গাঙ
দিন তিগে গাঙত ভাজি
সারাল্লে বগ' দগ থুত কুবি খাবদি থানা ঝুরিঝুরি
স্বনর জাল ফেলেই জাল তুলি
এগা ধারাজর বিজেইয়্যা অজার স্বনত
ক এক্কো সোনারঙ মাছ ফাল্লেই উদন
মাচ্য দেবেদা জাগি ন' উধে
রেনি ন' চায়।

## বেহাল

**(বাংলা অনুবাদ)**

এক জুম থেকে অন্য জুমে
পাহাড়ের শীর্ষে কিনারে কিনারে
পুরনো জুম ক্ষেত ফেলে নতুন জুম ক্ষেতে বসত করা
দা কাল্লোঙ বারেঙ লাবাক কাপড় চোপড়
ধানসহ ক্ষেতের বীজ
ভাঙা ফুল বারেঙের তলায় সোনার কান ফুল
রঙ খসে পড়া পায়ের খারু চুড়ি
ঐতিহ্যের গভীরে আহ্বান জানায়।

ঐতিহ্যের অবগুণ্ঠন ভেঙে মৎস্য দেবতাকে পূজা দিয়ে
মাছ ধরার ফাঁদ নিয়ে
ছরায় জলসেচন করতে যাওয়া
জলসেচন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ছরায় শুয়ে থাকা।

দিনভর ছড়ায় গাঙে ঘুরে বেড়ানো
একাকী ধ্যানী বকের মত লোভী ঠোঁটের মগ্নতায়
স্বপ্নের জাল ফেলা আর জাল তোলা
একান্ত মগ্নতার বিছানো জালের স্বপ্নময়তায়
কয়েকটি সোনারঙ মাছ লাফিয়ে ওঠে
কিন্তু মৎস্য দেবতা জেগে ওঠে না।



## চিত মন আর ন' ভিজে

ধবধবা জুনোপহ্‌রে মৌন মুরো ভিজি যায়
ভিজি যায় কলগ' আদাম,
ঝরত ভিচ্চে পেগো সান, বেগ পেঝেরা
তুয়্য কার' দুনদুগ নেই।
জুনো পহ্‌রর সদচ্চে আল্যাঙে বেক্কুনে নিগুচ্ আমলি।
সে জুনো পহ্‌রে চিত্ মন আর ন' ভিজে।

যে মৌন মুরোত ইত্তোকুদুম শিঙোর পালু
আবুঝি রইয়্যেন মাদি কামেরে, পিরিত্তুন পিরি
জুমে জুমে বেড়েয়োন, লাঙেলর পধ রাঙেয়োন
ছড়াথুম মাদেয়োন, মেলোনী পাদার ন' ভাঝেয়োন,
এচ্চে সে মৌন মুরো কেযান অচিন অচিন
বিশ্বাচ হ্যারা সদিভাঙা মিলে দগ
আন্দলে আন্দলে চোগপিঝি রেনি চায়,
সেই মৌন মুরোত চিত্ মন আর ন' ভিজে।

পত্তিদিন পত্তে আমল্লে পেগো কোলকোলিত
ঘুম ভাঙি যায়,
কধ পেগে গীদ গান, কধ পেগে ইচ্চে সুগে উড়ি বেড়ান
ইরুক বেন্নে ঘর কেবার মেলিলে
উদোনত ইজোরত মৌন মুরো কলগত
থল ভুইয়োত ছড়াছড়ি গাঙ পাড়ত
বানা কবা ঝাক, খারখাজ্যে আবাজ অনসুর
এ খারখায্যে আবাজত চিত মন আর ন' ভিজে।

## হৃদয়ে আর প্রশান্তি নেই
**(বাংলা অনুবাদ)**

জোছনার উজ্জ্বল আলোয় পাহাড় ভিজে যায়
ভিজে যায় বিস্তীর্ণ উপত্যকা আর গ্রাম,
বৃষ্টিতে ভেজা পাখির মত সবাই জবুথবু
তবুও কারও বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই।

জোছনার নিবিড় ভালোবাসায় সবাই মাতাল
ইদানিং সে জোছনার আলো কেমন যেন অহংকারী
কেমন যেন পলায়নপর,
এ জোছনার আলোতে আর হৃদয়ে প্রশান্তি আসে না

যে পাহাড়ে বংশপরম্পরায় বসতি
মাটিতে রেখেছে বুক, যুগে যুগে ঘুরে বেড়িয়েছে
জুম থেকে জুমে
রাঙিয়েছে তারা পাহাড়ের পথ,
ছরার এদিক ওদিক মাতিয়েছে
মেলোনী পাতার নৌকা ভাসিয়েছে
আজ সে পাহাড় কেমন যেন অচিন অচিন মনে হয়।
সে পাহাড় ধর্ষিত যুবতীর মত ভয়ার্ত
আড়ালে আবডালে যেন চোখ রাঙিয়ে যায়
সেই পাহাড় দেখে হৃদয়ে আর প্রশান্তি আসে না।
প্রতিদিন পাখি ডাকা ভোরে ঘুম ভেঙে যায়
আর কত পাখির গান, মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ানো
ইদানিং ভোরে ঘর থেকে বেরোলেই চোখে পড়ে
ঘরের আঙিনায় মাচাঙে, পাহাড়ের উঁচু নিচু খাদে
ছরায় গাঙে অচিন পাখির শুধু ঝাঁক ঝাঁক সম্মিলন
চারদিকে শুধু কর্কশ শব্দ
এ কর্কশ শব্দ শুনতে শুনতে হৃদয়ে আর
প্রশান্তি আসে না।



## নিকোলাই চাঙমার কবিতা

### এয এদেদি

যুনিও মেগুলো দেবা পহর ছিদে
পেরগা রঙে আগাচ্চে। তা পর
সারাঙ বিরাঙ দেবা দেই ন ভাবিচ,
মেগুলো মেঘে চাকবুদি ন এব।
সে দেবাত মেঘে আর চুগ খেব।
সালেন কেনে এ পেরগা সুগত
কমরপিচ ইরিদি গুচ্চাঙ।
মালেয়ে নয়, আমনর গরজে
চাদিগাঙ ছারা পালার বান হুয়ে
লরা এয এদেদি। এদেদি।

### এসো দক্ষিণে
**(বাংলা অনুবাদ)**

যদিও মেঘলা আকাশের আলো
ময়লা রঙের। তার পরেই
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আকাশ দেখে ভেব না
মেঘলা আকাশে মেঘ আবার জমবে না।
সে আকাশে আবার মেঘ জমবে।
তবে কেন এ ময়লা সুখে
কোমরের বেল্ট খুলে গা এলিয়ে শুয়ে পড়া।
নিমন্ত্রণ নয়, নিজেরে তাগিদে
চাদিগাঙ ছাড়া পালা'র গিঁট খুলে
লড়াইয়ের জন্য চলে এসো দক্ষিণে। দক্ষিণে।

## আলোড়ন খীসার কবিতা

### মোনের দুঃখ

ফেলে চলছি মোনের দুঃখের জড়তা, যেভাবে মোনের শীতল জল নির্দেশ করে চলছে তার উৎ-সমুখ। একা একা বয়ে ধুয়ে নিয়ে যায় মোনের কলঙ্ক, সাথে প্রতিবেশীর উচ্ছ্বাস ঘোরানো পথে পাড়ে গিয়ে দিক পায়। কতকাল দেখেছি সে লুকিয়ে রেখেছে ঐশ্বর্য প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত রেখে, আমাদের আড়াল করেছে তার সৈন্যগণ দ্বারা শত্রুর প্রলুব্ধ চাহনির জোড়া জোড়া চোখ থেকে; সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সবুজাভ ছাতার নিশ্ছিদ্র ভয়হীন প্রান্তরের খাঁজে খাঁজে। আজ হঠাৎ মোনের বাতাস সংগ্রহে গিয়ে দেখি, তার পোশাক খুলছে ধর্ষণের ভঙ্গিতে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী ! যাদের ডোরাকাটা দাগ ছড়াচ্ছে ভয়ের বিষাক্ত বাতাস আর এই বাতাসে একে একে টুপটুপ ঝরে পড়ছে মোনের সব প্রতিবেশী প্রতিরোধহীন মননে, গড়নে। আবার কেউ স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিচ্ছে ছরার বিছানায়, উৎফুল্ল কামে!

*মোন- পাহাড়, (চাকমা শব্দ)

### শরনার্থীকালে

০১.

আমার দীর্ঘশ্বাসের কারণ জানে জয়নিতা
যে কালকেও আমার সাথে স্বর্গ তোরণে উঠতে রাজি ছিল না,
আজকে সে  আমার হাত ধরে পেরোচ্ছে ভয়ের মুমূর্ষু অসুখ ।

০২.

পেটপুরে খাইনি তাই চেরাগের কমতি আলোয় মিইয়ে আসছে ইন্দ্রিয় সকল। চেরাগ, সে না জ্বলুক আমার বুকে তো জ্বলছে একটা নতুন পথ খুঁজে পাওয়ার টিমটিম আলোকণা।

০৩.

অবশেষে পৌঁছে বিদায় নিলাম সকল আত্মীয়দের অসুখ থেকে। বুকে এখনো ধরে রেখেছি তাদের আফসোস, প্রতিবাদের রুগ্ন কণ্ঠের হতাশ অথচ সূর্যের করোটি ভাষাসমূহ ; তাই আমার সম্বল।



### সমকাল (আহা, আমাদের মনোগাঠনিক রসায়ন)

০১.

আজকে বৈঠকে প্রজাপতির সঙ্গীত নিয়ে এসেছেন
স্বপ্নপঙ্গু করা একদল বিছিন্ন প্রহরী।
ফিরে ফিরে গাইছেন তারা কালনাগিনীর উদ্দাম নৃত্যের কতিপয় তাল।
পাহাড়ি সদর দরজা দিয়ে তীব্র আঘাতে বেরোচ্ছে ভয়াল তালের বিষের পানীয়
আর বিষিয়ে তুলছে সমগ্র অস্তিত্ব।

০২.

জানি বলেই হয়তো এগোইনি
সামনের দীঘল কাঁটার রাস্তায়
যদি উৎ পেতে থাকে হায়েনার দল !
ভয় পেয়েছি, মূর্ছা গেছি অবান্তর চিৎকারে
জোনাকির প্রহরি আলোয় চিতার রঙ দেখেছি কালো
আর আমাদের যোদ্ধারা ফিরে যাচ্ছে
মায়ের কাছে, সাপের পায়ে পায়ে।
যারা কথা বলেছিল, তারা আজ নিহত
আহত প্রভুরা মিশে গেছে, ফুরিয়ে গেছে
নিঃসঙ্গতার করুণ রাগে
যেন তারা কোনদিনই জানেইনি প্রাণহীন জীবনেও ছন্দের রাতে
বেহুলা বাতাস একাকী টেনে নেয়
কর্ণফুলীর গাঢ় কালো জলের ছায়ায়।

০৩.

এক পা, দুপা করে হেঁটে এলাম তার সরু পথের কিনারা,
হাঁটতে গিয়েই আবার হারালাম চেনা পথের সব ঘাসেদের ইতিহাস।
অথচ আমিও তার জন্য বর্শিতে ফেলেছি সুস্বাদু প্রলোভনী পসরা
যেন সে একবারেই তুলে ফেলতে পারে সমস্ত আদরী শুভেচ্ছা ।

০৪.

ঘুমোবতীর ঘুমে তাপ দিয়ে এসো
বিষণ্ন বিকেলে গাইতে পারো
দিনবিরহের অজানা কারণের ব্যথাগীত।
সাথে এই খোঁড়া স্বপ্নের মধ্যবিত্তের গৃহে

ভেসে আসছে বিলাসবহুল প্রসাধনীর ঘোর লাগা ঘ্রাণ
যেখানে আমার অস্তিত্বে ছিলো না কোন
বিরহের কান্নাসঙ্গীত
কিংবা জুমের উত্থানের প্রক্রিয়াবিশেষ
আজ এখানে শত শত হুল ফুটছে বিনীত রাগে

## রাখালি এবং আমি

হঠাৎই ঘুমঘোরের বিকেলে
শতবারের অধিক ভেবেছি
একটি রাখালি বালিকার
লালচুলের জটের সমান
অবাক বিস্ময় দেখাবো তোমাকে
সামনে থাকবে সাপখেলার ভয়ালতা
তুমি সাপ ছুঁতে গিয়েও
ফিরে আসবে অকস্মাৎ
ভয় জড়ানো চোখে
অথচ তাকিয়ে থাকবে নির্নিমেষে
তুমি সাপ ছুঁতে গিয়েও
বারবার ফিরবে ভয়ের সরল বিশ্বাসে



# আকশো

## জে আর কার্বারী

বৈজেক্ক্যের হালা দেবা এযের তরে হেবাত্তে
বান্দর দখ নাজেবো গাধা দক্ষ্যা আজেবো মুলা দিবাত্তে
আলমারিবুওত সুমরি থনা  পুরোন রিদি সুদোম
বিজোগরে পুন মারে  নুঅ গরিবুও হুদুম
তচ থানা তে- গম ন পায় তেবো বানা গায়
এজো ভেই লক এয যেই, বোনুন আমি ডাগি চেই
পাদা গদা দি অলেও তারে আমি নাদি থেই
গাচ্ছুন খেল বাশুন খেইল খেইল ডেবার মাছ
উবোস খাবাস রাঘে মরে মারে বার মাস
খেইবার চেলে খেইপুরেলো নিলো আজিপুজি
বাগল চাগল জা আগে ভিদিরেও সুজি
ফুল কুড়িগুন জরে দিবো নাপেই আমি ফুল
আমর বোলুন ফেলেই দিনে গাচ্ছুন গরে ধুল
রাঙ্গা গোলাপ ন ফুদোন ন থান বাগানত
শদরক্ষুন ন আজন ন থান কড়ানত
ভালুগর নাচ, বান্দরো নাচ উচ্ছ কিত্তে তুই
গলাত হাজি ন থেলে ধবেগে জিত্ত অন
ঝাড়বুও লুদির হিড়ব্যে গিত্থে খুলোচ কিত্তে তুই
ভাবি ন চাছ এক্কানাও জত্তে কা সিদু !
বুগর ভিদিরে লৌপুদো রাঘাস তুই কাত্তে
শেষ কাদাল্ল্যা বুজিবে ধরা জেক্কে হেবে জাত্ত্যা!

## আকশো

**(বাংলা অনুবাদ)**

ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী  গ্রাস করতে তোমায়
বাঁদর নাচা নাচাবে গাধার হাসা হাসাবে মুলা দেবে আমায়
আলমিরাতে গুছিয়ে রাখো পুরনো সব সংস্কৃতি
ইতিহাসকে ধর্ষণ করে দেবে না সে স্বীকৃতি
আসো ভাইরা আসো রে, বোনদের তোমরা ডাক রে
অস্তিত্ব যে  মানে না সে থাকবে শুধু একা
পাতার বাঁধন দিয়ে হলেও তারে শুধু ঠেকা
গাছ খেয়েছে বাঁশ খেয়েছে, খেয়েছো হ্রদের মাছ
উপোস করে রাখবে আমায় মারবে বারমাস
খাইতে চাইলে খেয়ে নিক
বাহির ভিতর যা রয়েছে সবই নিল শুষে
ফুটন্ত যে কুড়িগুলো জড়বে অকালে
বাড়ন্ত মোর আম্র মুকুল পরবে সকালে
ফুটবে না আর রুদ্র গোলাপ তোমার বাগানে
শত রঙেরা খেলবে না আর জুলবে না গলে
ভালুক নাচন, ভোদর নাচন, মুগ্ধ কিসে হয়
বাঁধন খুলে গাইতে পারলে সবাই করে জয়
জঙ্গলেরও লতার বাঁধন খুললে কি করে
ভাবছ নাতো একটুও যে যাচ্ছ কার ঘরে?
বুকের মাঝে রক্ত ফোটা রাখছ তুমি কার
শেষ সময়ে বুঝবে তুমি যখন খাবে মার!



## হেগা চাকমা

**বাজার ফেরত কলাছড়া**

ন পরে তে কারো চোগৎ, তে!
তে অলদে ইজ্জু বাজার ফেরত কলাছড়া।

গেরোজো ঘরৎ আওজর ধন তে
ভরন্দি আদাম এল তা চম্পক্নগর
ন চিনে হাট, ন চিনে বাজার
কোচপানা থবেল আজার আজার।

অক্ত এল বাদি অল, মোলামুলিত হোল বুদিল
মোলেই চেল কদক চেলায়,
চিরোকিত্তে র উদিল–
“বাজারো কলাছড়া কন্না ন মোলায়?”

মোলামুলি থেলাঠেলিৎ যদন ভাঙ্গে যার
কোচপানা ন মানায়, শত্রু অয় দেবী বিয়েত্রার
আওলফাওল ছন্দভাজ গেজ্জুলী তে গায়
হুদু গেলে পেব সুঞ্জুক, ভাবি কূল ন পায়।

ছাড়া বাজারত্ পরি থায়, বেদমা কলাছড়া
বেয়্যারীর আহদ-বেআহেদ মলামুলিৎ আধামরা
গম অয় বজং হরে গেলে অক্ত
বাজারো কলাছড়া ভয়্যোন তারে, বুড়োবুড়িয়ে মক্ত।

ন মোলেবাক কোন জনে, ন ধুরিবাক তারে
বাজার ফেরত্ কলাছড়ালোই কন্না কারবার গরে?
জীংহানিত্ পদে পদে হেল তে ঠগা
তে অল এক হোবালপোড়া- হেগাবগা।

## অচল পণ্যমানব
**(বাংলা অনুবাদ)**

অলক্ষ্যে হেঁটে যাই
অবহেলা-অপমানে
ব্যর্থ প্রেমিক হেগা;
জীবন মানে গল্প, মানে জানি অল্প।

স্মৃতিতে জীবন্ত চম্পকনগর, ফিরাও তারে ঘরে
অন্ধের যষ্টি যাবে কি ঝরে?
পণ্যের বাজারে মানুষ অসহায়
একবুক ভালবাসা, হয় নি যে সহায়!

উন্মোচিত হল সকল সম্ভাবনার তালা-
চারিদিকে বিনিয়োগ হাতে, ব্যবসায়ীর মনোজটিলতা তাতে
সবাই বলে উঠলো- "চিয়ার্স, ধন্য মোরা ধন্য
বাজারে উঠেছে এক সম্ভাবনাময় পণ্য!"

গরম বাজার পলিটিক্স, চরম দরপতন
পাবলিক অচেতন রয়, খুঁজে- ভালবাসা কারে কয়?
বিয়েত্রা গেল উড়ে প্রেমের বন্ধন ছিঁড়ে
গেজ্জুলি গায়েন ভাবে- দেবীরাও অর্থশাস্ত্র পড়ে!

পড়ন্ত বাজারে নগণ্য পণ্য
বেপারীর চোরাকারবারে প্রতারিত হই বারেবারে
আমি তো সময় গুনি, সময়ের গতি বদল মানি
মানব পণ্য মানুষেরই জন্য, বলেছেন জ্ঞানীগুনী!

মানব পণ্য মানুষেরই জন্য
অদ্ভুত বাজার বসবে আবার
ক্রেতাহীন বাজারে পণ্যরা সব ধন্য কবি
যেন এক নিরেট বাজারের বোকা ছবি
স্বপ্নরাজ্যের মাতাল কবি!
অসহায় চেয়ে থাকে মাতম কবি

বিয়েত্রা- বিবাহের দেবী।
গেজ্জুলি- চাক্‌মা গায়েন, গীতিকবি।





## লেখক পরিচিতি

প্রশান্ত ত্রিপুরা : বিভাগীয় প্রধান, (প্রাক্তন) নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
পাইচিংমং মারমা : ব্লগার, উন্নয়নকর্মী।
হেগা চাকমা : কবি, ব্লগার, ছাত্র, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
এডিসন চাকমা সমাজকর্মী, অনলাইন এক্টিভিষ্ট।
অজল দেওয়ান : অনলাইন এক্টিভিষ্ট, ছাত্র, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
সুমেধ তাপস চাকমা : অনলাইন এক্টিভিষ্ট, ছাত্র, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
জে আর কার্বারী : ব্লগার, অনলাইন এক্টিভিষ্ট।
শিশির চাকমা : কবি, প্রাক্তন সভাপতি জাক।
নিকোলাই চাকমা : কবি।
অদ্রি প্রথম : গল্পকার, অনলাইন এক্টিভিষ্ট।